সুদঃ পরিষ্কার বিদ্রোহ

আর কতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ?



মুফতী আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

সুদ : পরিষ্কার বিদ্রোহ

আর কতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ?

মূল

মুফতী আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী رحمه الله

মুফতী আযম পাকিস্তান, প্রতিষ্ঠাতা: দারুল উলূম করাচী

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী حفظه الله

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী
সদর : বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ, পাকিস্তান

সংকলন

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

দাওরা ও ইফতা: জামিআ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস: জামিআ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব: নিকুঞ্জ (উত্তর) জামে মসজিদ ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন 👇

https://t.me/islaMic_fdf

সুদ : পরিষ্কার বিদ্রোহ

আর কতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ?

মূল : মুফতী আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
সংকলন: মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
পঞ্চম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-47-0

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/maktabatulashraf,	www.wafilife.com,	khidmashop.com
✆16297 or 01519521971	✆ 01799925050	✆ 01939773354

আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭৪১-৯৭১৯৬৭
ভিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

মূল্য : দুইশত ষাট টাকা মাত্র

SHUD : PORISHKAR BIDROHO

By: Mufti Azam Mufti Muhammad Shafi
Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Muhammad Habibur Rahman Khan

Price: Tk. 260.00 US$ 3.00

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ
تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ
لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।

সুদের গোনাহ্ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক

(٥) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا رِبًا فَهُوَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِيْنَ زَنِيَةً وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلٰى بِهِ. اخرجه الطبراني في الكبير (٩٤/١١) (١١٢١٦) والاوسط (٤٥١/٣) (٢٩٦٨) وقال في المجمع (٢١٢/٥) وفيه ابو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَا اَلْاِسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ أبوداؤد رقم الحديث : (٤٨٧٦) مسند احمد (١٦٥١)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক দিরহাম সুদ খাওয়া তেত্রিশবার (কোন কোন বর্ণনায় ছত্রিশবার) ব্যভিচার করার চাইতে বড় গোনাহ্। আর হারাম মাল দ্বারা যে মাংস গঠিত হয়, তার জন্য আগুনই যোগ্য। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ্। –(তাবরানী : ১১ : ৯৪, হাদীস নং ১১২১৬, আবু দাউদ : ৪৮৭৬, আহমদ : ১৬৫১)

بسم الله الرحمن الرحيم

সংকলকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সর্বজন শ্রদ্ধেয় দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর সাথে বুয়েট হজ্জ গ্রুপে যারা হজ্জে গিয়েছিলেন, বুয়েট শিক্ষক ক্লাবে তাদের হজ্জ ফেরত শোকরিয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হযরত প্রফেসর ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবারের নতুন হাজী ছাহেবদেরকে তাদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য বললেন। একেকজন একেকভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছেন। এক পর্যায়ে বুয়েটের প্রবীণ একজন অফিসার তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, হজ্জতো সুন্দরভাবে করে আসলাম। দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে আমলের আগ্রহও জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন অবসরে যাবো, তখনতো বুয়েট থেকে পাওয়া পেনশনের টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ খাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

একথা এমন একজন সৎ অফিসার বললেন, যার শিক্ষা ও পেশা এমন যে তিনি যদি চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার পরও সে পেশার চর্চা অব্যাহত রাখেন তাহলে তাতেও তার পর্যাপ্ত আমদানী হবে। অথচ তিনিও সুদে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন। কারণ সুদের জাল আমাদের দেশে এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এর থেকে মুক্ত থাকা এখন দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন উচ্চস্তরের মুত্তাকী ব্যতীত সাধারণের জন্য কঠিনই বটে। এখন সুদের বিস্তৃতি এমনভাবে হয়েছে যে, তার সর্বগ্রাসী থাবা থেকে মসজিদ মাদরাসার ফান্ডকেও মুক্ত রাখা কষ্টকর হচ্ছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যক্তিত্বের আবাসস্থলের সরকারি মসজিদের সম্মানিত ইমাম ছাহেব আফসোস করে বললেন, আমার মসজিদে রমযানে ইমাম ছাহেবের জন্য ইফতারী ও সাহরীর খরচ দেয়া

হয়। আমি এ খরচের উৎস সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি এ ফাণ্ডের জন্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন, যা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট আকারে রাখা হয়েছে। সে ফান্ডের সুদের টাকা দিয়েই এ খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি এটা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি।

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী একটি মাদরাসার পরিচালনা কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য আমাকে বললেন, হুজুর! আমাদের মাদরাসা ফান্ডে বেশ কিছু টাকা অলস পড়ে আছে। এ টাকা যদি আমরা কোন ইসলামী ব্যাংকে রেখে তার থেকে লভ্যাংশ নেই তাহলে কি কোন অসুবিধা আছে? এতে তো মাদরাসা ফান্ড বাড়বে।

আমি তাকে বললাম, আপনার মতোই একজন বড় ব্যবসায়ী তার অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছেন যে, সকল ব্যাংকই প্রায় একরকম। শুধু শব্দ ও পরিভাষা ভিন্ন।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (এমন কি রাজধানী ঢাকাতেও) বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন বিভিন্ন সমিতি ও সোসাইটিতে যোগদান করে অনেক ক্ষেত্রেই জেনে না জেনে সুদের মতো মারাত্মক হারাম লেনদেনে জড়িয়ে পড়ছেন। 'মুযারাবা', 'মুরাবাহা', 'শিরকাত', 'ইজারা', 'ফিকহুল মু'আমালাতের এ সকল পরিভাষা ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে নির্ভেজাল সুদী কারবার করছেন। হ্যাঁ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।

আমাদের পরিচিত একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জানালেন তার এলাকার এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এবং প্রতি মাসে একটি নির্ধারিত অংকের লাভ তাকে দেয়া হচ্ছে।

আমি তাকে বললাম যে, আপনার চুক্তিপত্রের কপিটি আমাকে দেখান, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। তিনি তখন তা আমাকে দেখালেন, আমি তাতে 'মুযারাবা' শব্দটি ছাড়া মুযারাবার আর কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। এটি নির্ভেজাল সুদী চুক্তিপত্র।

আমরা সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর যে কোন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। তবে এক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও আরও বেশি বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যাতে এসব ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শরঈ মানদণ্ডে পরিপুর্ণ উত্তীর্ণ হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মহতি উদ্যোগ আন্তঃসারশূণ্য নাম-সংকীর্তণে পর্যবসিত না হয়।

আমরা আমাদের শৈশবে দেখেছি, গ্রামে বসবাসরত (এ দেশের অধিকাংশ নাগরিকের জীবনচিত্রও এটাই) লোকেরা তাদের জমিতে ফসল ফলায়, বাড়ী সংলগ্ন (পালানে) সবজী চাষ করে, কিছু গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালন করে, পুকুরে প্রচুর মাছ থাকে, এসকল ক্ষেত্র থেকে যা আমদানী হয় তা দিয়ে কেউ সচ্ছলভাবে, আর অধিকাংশ নাগরিকই কোনওমতে তাদের সংসার ও পরিবার নিয়ে জীবন যাপন করে। সে সময় সমিতি, সোসাইটি, ব্যাংক ও বীমা ইত্যাদির এমন ব্যাপক প্রচলনও ছিল না এবং এসকল প্রতিষ্ঠানে রাখার মতো অর্থ-কড়িও বলতে গেলে কারো নিকট ছিল না। কিন্তু বর্তমান চিত্র একেবারেই ভিন্ন অনেকের হাতেই প্রচুর কাঁচা পয়সা আসছে, সমিতি, সোসাইটি, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে সমাজের প্রায় সকলেই এমনকি গ্রাম্য এমন মহিলাগণ পর্যন্ত, যারা এ যুগেও কুড়ির হিসাব ছাড়া গণনাই জানে না, তারা পর্যন্ত সুদী কারবারে জড়িয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও সংস্থা, ব্যাংক, এনজিও ও সমিতির নামে দেশ-বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার ফান্ড এনে কর্তা ব্যক্তিরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে, আর যাদের ছবি ও ভিডিও চিত্র দেখিয়ে সাহায্য আনা হয়, তাদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে দরিদ্রদের আরো দরিদ্র বানানো হচ্ছে। আর এটাকেই দারিদ্র্য বিমোচন নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এ নিয়মে (অর্থাৎ সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করে) কেয়ামত পর্যন্তও দারিদ্র্য বিমোচন হবে না এবং তা কখনও হওয়া সম্ভব নয়। বরং অর্থনৈতিক বৈষম্য এতে দিন দিন বাড়তেই থাকবে, যা এক সময় সমাজ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা একেবারেই শেষ করে দিবে।

মজার ব্যাপার হলো, সুদের এই মারাত্মক ফাঁদে এদেশের বিত্তহীন দরিদ্র শ্রেণীকে এভাবে আবদ্ধ করার, এ কৌশলটা অতি প্রাচীন সুদখোর জাতি ইহুদী ও হিন্দু বেনিয়াদের মাথায়ও আসেনি বরং তা এসেছে আমাদের এদেশের এক মুসলিম সন্তানের (যার বাবা-মা বড় সাধ করে তার নামটিও একজন নবীর নামে রেখেছিলো) উর্বর মস্তিস্ক থেকে। ফলে সুদের জালে সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে আবদ্ধ করে যে ইহুদী জাতি বিচিত্রসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছে তারাও বিস্মিত না হয়ে পারেনি। তাই তো তারা এ ব্যক্তিকে (যে কিনা সুদের জালে আটকে এ মুসলিম জনগোষ্ঠিকে অশান্তির দাবানলে নিক্ষেপ করেছে) শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দিয়ে এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় সারা বিশ্বের জন্য আদর্শরূপে উপস্থাপন করছে।

অথচ ইসলামী শরীয়তে 'সুদ' হারাম হওয়ার বিষয়টি কোন গোপন বিষয় নয় যে, এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য ভিন্নভাবে আবার পুস্তক রচনা করতে হবে!

যে ব্যক্তিই কোন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে সে এতটুকু কথা অবশ্যই জানে যে, ইসলামী শরী'আতে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বরং একথা তো অনেক অমুসলিমও জানে। এ কথাও অনেকের জানা আছে যে, সুদের প্রচলন পৃথিবীতে নতুন নয়। ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতেও এর প্রচলন ছিলো। মক্কার কাফেরদের মধ্যে যেমন এর প্রচলন ছিলো, মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্যেও এর ব্যাপক রেওয়াজ ছিলো। তারা কেবল ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর জন্যই যে সুদী লেনদেন করতো তা নয় বরং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও সুদের লেনদেন হতো।

তবে বিগত দু শতাব্দীতে যে বিষয়টি নতুনরূপে সামনে এসেছে তা হলো, ইংরেজ বেনিয়ারা যখন পৃথিবী জুড়ে ক্ষমতা দখল করলো, তখন তারা নতুন নতুন প্রক্রিয়ায় সুদখোর মহাজন ও ইহুদীদের প্রবর্তিত সুদী কারবারের এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটালো যে,তার ঘুর্ণাবর্তে পড়ে মানুষের বিচার-বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলল। ক্রমে তার চিন্তা-ভাবনা উল্টোমুখে ধাবিত হতে থাকল। পরিশেষে তা এ পর্যন্ত গড়াল যে, আজ পৃথিবীতে সুদী ব্যবস্থাকেই ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকার মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে। বাহ্যদর্শী স্বল্প জ্ঞানী লোকজন মনে করছে বর্তমানকালে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও আর্থিক কর্মকাণ্ড সুদ ছাড়া চলতেই পারবে না। অথচ অর্থ ও বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রবল স্রোতে যারা গা না ভাসিয়ে সকল বিষয়েই একটু গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করে এবং সবকিছুকেই তলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত এমন ইউরোপিয়ান ব্যক্তিবর্গের অভিমতও এটাই যে, সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয় বরং মারাত্মক ক্ষত ও ঘুনপোকা, যা মেরুদণ্ডে সৃষ্ট হয়ে তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত তা বের করে ফেলে দেওয়া না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর অর্থব্যবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে আসবে না। এটা কোন মোল্লা-মৌলবীর কথা নয়, বরং প্রাজ্ঞ একজন ইউরোপিয়ান অর্থনীতিবিদের কথা।

একথা অবশ্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আজ পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র সুদের জাল এমনভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তা ছিন্ন করার চেষ্টা যদি কেউ ব্যক্তিগত বা এককভাবে করে তাহলে তো

ব্যর্থকাম হবেই এমনকি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করা বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া কোন কিছু লাভ হয় না। এ অবস্থারই অনিবার্য ফল এই হয়েছে যে, সাধারণ ব্যবসায়ীগণ সুদের মতো এ মারাত্মক পর্যায়ের হারাম ও কবীরা গোনাহ এবং অর্থনৈতিক অভিশাপ হতে কিভাবে নাজাত লাভ হবে? এ চিন্তা-ভাবনাই এখন ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণ অপরিনামদর্শী মুসলমানের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু ঐ সকল দ্বীনদার ব্যবসায়ী যারা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের ক্ষেত্রে তো পুরোপুরি শরীয়তের পাবন্দ, এমনকি রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়েন, যিকিরও করেন, তারাও সকালে যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হন, তখন তাদের অনেকের মধ্যে আর সুদখোর হিন্দু বেনিয়া এবং ইহুদী ব্যবসায়ীর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারাও ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন ও জীবিকা উপার্জনের জন্য ঐসকল মাধ্যম অবলম্বন করে থাকে যা একজন সুদখোর বেনিয়া ও ইহুদী ব্যবসায়ী অবলম্বন করে। এটা আজকাল এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের আলোচনাকে নির্বুদ্ধিতা ও আধুনিক যুগের লোকদের ভাষায় নিরেট মোল্লাগিরি আখ্যায়িত করা হয়। এমন মোল্লা যারা পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ছাড়া উন্নয়নমূলক কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না।

অপরদিকে দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের সমাজ এমন গাফলতের শিকার যে এখন এমন মুসলমান পাওয়া যাওয়া অসম্ভব নয়, যার হয়তো এ কথা জানাই নেই যে, ইসলামে সুদী লেনদেন (সুদ প্রদান ও গ্রহণ) সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাছাড়া সুদের এমন এমন নতুন রূপ ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এমন ব্যাপকভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে যে, অনেক মুসলমানের এ খবরও হয়তো নেই যে, সেসব পদ্ধতি সুদী হওয়ার কারণে হারাম।

এতদ্ব্যতীত আর্থিক লেনদেনে এমনও অনেক পদ্ধতি আছে যার প্রচলিত রূপটি সুদী এবং হারাম। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা করলে খুব সহজেই এমন ব্যবসা ও কারবারকে সুদমুক্ত ও হালালরূপে খুবই সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন। ব্যবসায়ীগণ যদি সম্পূর্ণরূপে নাও পারেন তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি সে সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে সুদের অভিশাপ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ সম্ভব না হলেও সুদের লেনদেন

কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। অন্ততপক্ষে মুসলমান হিসেবে হারাম থেকে বিরত থাকার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করার ফরযতো আদায় হবে।

ইসলামী শরীয়তে অনেক জিনিষই হারাম। কিন্তু সুদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে যে কঠোর ধমকী ও সাবধান বাণী নাযিল করেছেন যে, [তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। -সূরা বাকারা ২৭৯] এমন ধমকী অন্য কোন গোনাহ সম্পর্কে নাযিল করেননি।

আমাদের এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য যদিও অধিকাংশ মুসলমানের হাতে কিন্তু সাধারণ মুসলমান ও ব্যবসায়ীগণ অনেক ক্ষেত্রেই হালাল-হারামের কোন পরওয়া করেন না। তারা নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুদি লেনদেন করতে থাকেন। কিন্তু এ সমাজেরই কিছু কিছু লোক এমনও আছেন যারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারকে হারাম থেকে মুক্ত রাখতে চান। তারা তাদের কাজ-কারবারে ফিকহুল মু'আমালাত তথা ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে চান। বিশেষত যে সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহপাক কোন আল্লাহওয়ালার সোহবত ও সান্নিধ্য লাভের তাওফীক দিয়েছেন এবং তারা তাদের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান হয়েছেন, তারা এ ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন। এ সকল ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত এ কথাই বলা হয় যে, অমুক আর্থিক লেনদেন সুদের কারণে হারাম। অমুক পদ্ধতিটি জুয়ার আওতায় পড়ার কারণে হারাম। আবার আর্থিক লেনদেনের কিছু পদ্ধতির কিছু বিকল্প হালাল ও বৈধ পদ্ধতিও বাতলে দেয়া হয়। যাতে মুসলমানগণ হারাম হতে বাঁচতে পারেন। তাদের লেনদেন যেন সম্পূর্ণ সুদমুক্ত হয়। কিন্তু এটা জানা কথা যে, মাত্র কয়েকজন মানুষ সুদ হতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলে আর অবশিষ্ট লোকেরা সুদের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলে, কখনো ঐসকল সুদমুক্ত লেনদেনের পদ্ধতি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না।

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সুদবিহীন আদর্শ ও বরকতময় ইনসাফ ভিত্তিক সুষম অর্থনীতির বাস্তবায়ন ও তার সুফল লাভ তখনই সম্ভব হবে, যখন বৃহত ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য একটি সংখ্যা সুদের ধর্মীয় এবং জাগতিক, চারিত্রিক এবং আর্থিক ধ্বংস লীলা ভালভাবে অনুধাবন করে এ থেকে মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে প্রস্তুত হবে এবং ক্ষমতাধর কোন শাসক তার রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল সামর্থ্য ও ক্ষমতা দিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

মোটকথা কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে সুদের ব্যাপারে যে ধরনের ভয়াবহ সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথা ভালোভাবেই বুঝে আসে যে, সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ওযর দেখিয়ে এ ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখার কোন সুযোগ নেই। এ কঠিন গুনাহকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারব না বলে এর থেকে বাঁচার সাধ্যমতো চেষ্টাও করবো না, এটা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো, এ মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সামর্থ্য ব্যয় করা। তাতে সমগ্র পৃথিবী হতে সুদ বিলুপ্ত না হলেও আল্লাহ চাহেন তো সূদী কারবার কিছু না কিছু হ্রাস পাবেই।

এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে এ পুস্তক সংকলনের উদ্যোগ। এ পুস্তকের দুটি অংশ। প্রথম অংশ মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. রচিত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন থেকে নেয়া। এ অংশে মুফতী ছাহেব রহ. সুদ সংক্রান্ত দশটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির নিরিখে সুদের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অংশ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর তিনটি ভাষণ। এসকল ভাষণে তিনি সুদের সংজ্ঞা, সুদের প্রকারসমূহ, সুদের মারাত্মক আর্থিক বিপর্যয় এবং প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুদবিহীন বিকল্প পদ্ধতি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে তুলে ধরেছেন।

কিতাবখানা প্রকাশের এ শুভ মূহুর্তে আমি বিশেষভাবে শোকরিয়া আদায় করছি আমার মুরুব্বী মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ার আমীনুত তা'লীম জনাব মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের। কারণ হযরতের অতি কর্মব্যস্ততা দেখে আমি কেবল দু'আর আশায় এ কিতাব সংকলনের কথা বললে তিনি নিজ আগ্রহে তা দেখে দেয়ার কথা বললেন। তারপর তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে প্রথম অংশের শেষে যুক্ত দশখানা হাদীস মূল কিতাব থেকে তাখরীজ করেছেন এবং অনুবাদ নতুনভাবে করিয়েছেন। তারপর এই কঠিন গোনাহের ভয়াবহতা ফুটে ওঠে এমন অর্থবহ নামও তিনি দিয়েছেন। আল্লাহপাক হযরতকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ ও তাবীলাহ নসীব করুন। রূহানী ও জিসমানী কুওয়্যত দান করুন। আফিয়্যাত ও সালমাতীর সাথে তাঁর ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। তাঁর সকল দ্বীনী কর্মকাণ্ড কবুল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ভূমিকাটা অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেলো। অন্যান্য কিতাবের ভূমিকা লেখার সময় তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অনেক সময় জোর করে বাড়াতে হয়, আর এ কিতাবের ভূমিকার ক্ষেত্রে কলমে যেন জোয়ার এসেছিল। আল্লাহপাক কবুল করুন।

আমার আরেক শুভার্থী জামি'আতুল উলুমিল ইসলামিয়ার মুহতারাম শাইখুল হাদীস জনাব হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম ভূমিকা সংশোধন করে দিয়ে এর মান অনেক উন্নত করে দিয়েছেন। আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বদলা নসীব করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো কিতাবখানা ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়লে আমাকে জানানোর অনুরোধ করছি। যাতে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা যায়। এ কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারাই যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহপাক তাদের প্রত্যেককে উত্তম বদলা দিন। আমীন।

আল্লাহপাক আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। এর উসীলায় আমাদের প্রতিটি মুসলমানকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ	বিনীত
২১ শাওয়াল ১৪৩৫ হিজরী	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৮ আগস্ট ২০১৪ ঈসায়ী	৭, এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সুদ : পরিস্কার বিদ্রোহ

আর কতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ?


بسم الله الرحمن الرحيم

সংক্ষিপ্ত সূচি

ঈমানদারগণকে তাকওয়া অবলম্বন ও /২৫
সুদ ত্যাগ করার নির্দেশ /২৯
সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ /
দশ আয়াতে সুদের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে /৪৪
'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা /৪৯
আরবে প্রচলিত রিবা /৫১
সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী /৭০
সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ক্ষতি ও তার বিকল্প /৭৭
প্রচলিত সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা /৯৮
সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে /১২০

বিষয়সূচি

ঈমানদারগণকে তাকওয়া অবলম্বন ও সুদ ত্যাগ করার নির্দেশ	**২৫**
সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ	**২৯**
সুদখোরের করুণ পরিণতি	৩০
সুদ খাওয়ার অর্থ	৩১
শাস্তির কারণ	৩১
ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ বলার উত্তর	৩২
সুদ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি	৩২
সুদ ও সাদকাকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ	৩৩
স্বরূপের বিরোধ	৩৩
নিয়তের বিরোধ	৩৩
ফলাফলের বিরোধ	৩৩
সুদকে মেটানো সাদাকাকে বাড়ানোর ব্যাখ্য	৩৪
সুদকে নিশ্চিহ্ন করার অর্থ	৩৭
নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্রতার শিক্ষাসম্বলিত কতিপয় সহীহ হাদীস	৪২
দশ আয়াতে সুদের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে	**৪৪**
সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার দুটি আয়াত	৪৫
সুদ ও রিবা'র আরও কিছু ব্যাখ্যা	৪৮
'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা	**৪৯**
একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও তার উত্তর	৪৯
আরবে প্রচলিত রিবা	**৫১**
আল্লামা ইবনে জারির রহ.-এর বর্ণনা	৫১
মুফাসসির আবু হাইয়্যানের বক্তব্য	৫১
ইবনে আরাবী রহ.-এর বক্তব্য	৫১
ইমাম রাযী রহ.-এর বক্তব্য	৫২
ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ.-এর বক্তব্য	৫২
রিবার সংজ্ঞা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শব্দে	৫২
আলোচনার সারাংশ	৫২
হযরত ফারুকে আযম রাযি.-এর প্রশ্নে পাশ্চাত্যপন্থীদের অবৈধ ব্যাখ্যা	৫৪
ইমাম ত্বাহাবী রহ.-এর বক্তব্য	৫৫
হযরত শাহ অলিউল্লাহ্ রহ.-এর বক্তব্য	৫৫

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা ৫৭
সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা ৬০
ব্যাংকের সুদী ঋণের ক্ষতিসমূহ ৬১
আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল ৬৩
একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ৬৫
যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় ৬৫
সুদের আত্মিক ক্ষতি ৬৬
সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? ৬৬
আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি ৬৯
সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ৭০
১. সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বিরত থাকো ৭০
২. রক্তের নদী ও প্রস্তর নিক্ষেপ ৭০
৩. সুদখোরের প্রতি অভিশাপ ৭১
৪. চার শ্রেণীর লোক বেহেশতে যাবে না ৭১
৫. সুদের গোনাহ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক ৭২
৬. সুদ খাওয়া আল্লাহর আযাবকে দাওয়াত দেয় ৭২
৭. সুদ মূল্যস্ফীতি ও ভীরুতার কারণ ৭৩
৮. পেটের ভেতর সাপ ৭৩
৯. যে গোনাহ মাফ হয় না ৭৩
১০. ঋণগ্রহিতার হাদিয়া নিবে না ৭৪
সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ক্ষতি ও তার বিকল্প ৭৭
সুদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা ৭৭
'সুদ' কাকে বলে? ৭৮
চুক্তি ব্যতিরেকে বেশি দেওয়া 'সুদ' নয় ৭৯
ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা ৭৯
পবিত্র কুরআন কোন 'সুদ'কে হারাম সাব্যস্ত করেছে? ৭৯
বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Loan) সে যুগেও ছিল ৮০
আকৃতির পরিবর্তনে প্রকৃতি বদলায় না ৮০
মজার একটি গল্প শুনুন ৮১
আজকালকার মেজাজ ৮২
শরীয়তের একটি মূলনীতি ৮২
নববী যুগ সম্পর্কে একটি ভুল বোঝাবুঝি ৮২
প্রতিটি গোত্র এক-একটি 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল ৮৩
সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা সুদ ৮৪

সাহাবাযুগে ব্যংকিং-এর একটি দৃষ্টান্ত ৮৪
'চক্রবৃদ্ধি সুদ' ও 'সরল সুদ' দু-ই হারাম ৮৫
বর্তমান ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ৮৬
কমার্শিয়াল লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণে সমস্যাটা কী? ৮৬
আপনাকে লোকসানের ঝুঁকিও নিতে হবে ৮৬
প্রচলিত সুদি ব্যবস্থার অপকারিতা ৮৭
ডিপোজিটাররা সব সময়ই লোকসানের মধ্যে থাকে ৮৭
সুদের অর্থ উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় ৮৮
ব্যবসায় অংশিদারিত্বের উপকারিতা ৮৯
লাভ একজনের, লোকসান আরেকজনের! ৮৯
বীমা কোম্পানী দ্বারা কে লাভবান হচ্ছে? ৮৯
সুদের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা ৯০
সুদী ব্যবস্থার বিকল্প ৯১
ইসলাম অপরিহার্য বিষয়াবলিকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেনি ৯১
'সুদী ঋণে'র বিকল্প শুধু 'করজে হাসানা'-ই নয় ৯২
সুদী ঋণের বিকল্প 'অংশীদারিত্ব' ৯২
অংশীদারিত্বের শুভ ফলাফল ৯৩
অংশীদারিত্বের বাস্তবায়নগত জটিলতা ৯৩
এই জটিলতার সমাধান ৯৪
দ্বিতীয় বিকল্প পদ্ধতি 'ইজারা' ৯৪
তৃতীয় বিকল্প পদ্ধতি 'মুরাবাহা' ৯৫
পছন্দনীয় বিকল্প কোনটি? ৯৬
আধুনিক যুগে ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠান ৯৬
প্রচলিত সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা ৯৮
শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের চুক্তি লিপিবদ্ধকারী ৯৮
ব্যাংকে চাকুরি করা হারাম কেন? ৯৯
কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত 'রিবা' ৯৯
'রিবান নাসীআহ'-এর সংজ্ঞা ১০০
'রিবাল ফায্‌ল'-এর সংজ্ঞা ১০০
'সরল সুদ' ও 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' উভয়ই হারাম ১০০
সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহপাকের যুদ্ধ ঘোষণা ১০২
বর্তমান ব্যাংকগুলোর সুদ হারাম নয় কি? ১০২
বাণিজ্যিক ঋণের উপর সুদের স্বরূপ ১০৩
সুদ জায়েয হওয়ার ভ্রান্ত দলিল ১০৪

এরা কারা? ১০৫
বিধান প্রকৃতির উপর আরোপিত হয় – আকৃতির উপর নয় ১০৫
মজার একটি কৌতুক ১০৬
তাহলে তো শূকরও হালাল হওয়া দরকার! ১০৭
'সুদ'-এর স্বরূপ ১০৭
ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা ১০৮
নবীজীর যুগে বাণিজ্যের বিস্তার ১০৯
হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর বাণিজ্যিক কাফেলা ১১০
সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা সুদ ১১০
সাহাবাযুগে ব্যাংকিং-এর একটি দৃষ্টান্ত ১১১
সুদ জায়েয হওয়ার পক্ষে আরও একটি দলিল ১১২
কারণ ও বিধানে পার্থক্য ১১৩
মদ হারাম হওয়ার হেকমত ১১৪
শরীয়তের বিধানে ধনী আর গরিবের কোনো পার্থক্য নেই ১১৫
লাভ-লোকসান উভয়ে অংশীদার হতে হবে ১১৬
বেশি অবিচার ঋণদাতার উপর ১১৭
সুদের গুনাহের সর্বনিম্ন স্তর মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা ১১৯
সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে ১২০
এক সওদাগরের বিস্ময়কর ঘটনা ১২১
বড় এক পুঁজিপতির উক্তি ১২১
গরিব ও ধনীর ব্যয়ের পার্থক্য ১২২
সুদখুরির মানসিকতা কৃপণতা জন্ম দেয় ১২২
এক সুদখোর ইহুদির ঘটনা ১২৩
হিন্দু সুদখোর জাতি ১২৪
হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ ১২৫
অর্থনৈতিক পাপ কার্পণ্য জন্ম দেয় ১২৫
বেশি-বেশি এই দু'আটি করুন ১২৫
হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করা জায়েয ১২৬

প্রথম পর্ব

কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ও যুক্তির নিরিখে

সুদের ভয়াবহতা

মুফতী আযম মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.

ঈমানদারগণকে তাকওয়া অবলম্বন ও সুদ ত্যাগ করার নির্দেশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

আয়াতসমূহের তরজমা

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয়, ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মত! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ

হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে! অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ২৭৫-২৮১)

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

যারা সুদ খায় (অর্থাৎ, গ্রহণ করে), তারা (কিয়ামতের দিন কবর থেকে) দণ্ডায়মান হবে না, কিন্তু যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয় (অর্থাৎ, হতবুদ্ধি মাতালের মত দণ্ডায়মান হবে)। এ শাস্তির কারণ এই যে, এরা (অর্থাৎ, সুদখোরেরা, সুদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্যে) বলেছিল ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মত (কেননা, এতেও মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বৈধ। কাজেই অনুরূপ যে সুদ, তাও বৈধ হওয়া উচিত)। অথচ (উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি বিধি-বিধানের মালিক) ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (এর বেশী ব্যবধান আর কি হতে পারে?) অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (এ সম্পর্কে) উপদেশ এসেছে এবং সে (এই সুদখোরী ও কুফরী বাক্য অর্থাৎ, সুদকে বৈধ

বলা থেকে) বিরত হয়েছে (এবং তাকে হারাম মনে করে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ।) তবে যা কিছু (এ নির্দেশ নাযিলের পূর্বে (নেয়া) হয়ে গেছে, তা তার (অর্থাৎ, বাহ্যিক শরীয়তে তার এ তাওবা কবুল হয়েছে এবং নেয়া অর্থের মালিক সেই) এবং তার (আভ্যন্তরীণ) ব্যাপার (অর্থাৎ, সে মনে-প্রাণে বিরত হয়েছে, না কপটতা করে তাওবা করেছে, তা) আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। (খাঁটি মনে তাওবা করে থাকলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা না করার মতই হবে। তার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করার অধিকার তোমাদের নেই।) এবং যারা (উল্লিখিত উপদেশ শুনেও এ উক্তি ও কর্মের দিকে) পুনরায় ফিরে আসে, তবে (তাদের এ কাজ স্বয়ং কবীরা গুনাহ্ তথা মহাপাপ হওয়ার কারণে) তারা দোযখে যাবে (এবং তাদের এ উক্তি কুফরী হওয়ার কারণে) তারা তথায় (দোযখে) চিরকাল অবস্থান করবে। (সুদ গ্রহণে আপাতদৃষ্টিতে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও পরিণামে) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। (কখনও ইহকালেও সব ধ্বংস হয়ে যায়, নতুবা পরকালে ধ্বংস হওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিপরীতে দান-খায়রাতে আপাতদৃষ্টিতে অর্থ হ্রাস পায় মনে হলেও পরিণামে) আল্লাহ্ তা'আলা দানকে বর্ধিত করেন। (কখনও ইহকালেই বৃদ্ধি করেন, নতুবা পরকালে বৃদ্ধি পাওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে অনেক ছওয়াব পাওয়া যাবে; যেমন পুর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে।) আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না (বরং অপছন্দ করেন,) কোন অবিশ্বাসী, (যে উপরোক্ত বাক্যের মত কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে এবং এমনিভাবে পছন্দ করেন না) কোন পাপীকে (যে উল্লিখিত কাজ অর্থাৎ সুদের অনুরূপ কবীরা গুনাহ্ করে)।

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, (বিশেষত) নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে ছওয়াব রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা হবে না এবং তারা (কোন উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ার কারণে) দুঃখিতও হবে না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (কেননা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই ঈমানের দাবি) অতঃপর যদি তোমরা (একে কার্যে পরিণত) না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও (অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে এ কারণে জিহাদ ঘোষণা করা হবে)

এবং যদি তোমরা তাওবা করে নাও, তবে তোমাদের মূলধন (ফেরত) পেয়ে যাবে। (এ আইনের পর) তোমরাও কারও প্রতি অত্যাচার করতে পারবে না, (মূলধনের চেয়ে অধিক নিয়ে) তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (মূলধনও ফেরত না দিয়ে) এবং যদি (ঋণগ্রহীতা) অভাবগ্রস্ত হয় (এবং এ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে,) তবে (তাকে) সময় দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত। (অর্থাৎ যখন সে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে সে সময় পর্যন্ত) এবং (সম্পূর্ণভাবে) ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা (এ ছওয়াব ও বিনিময় সম্পর্কে) জ্ঞানবান হও।

(হে মুসলমানগণ,) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে হাযিরার জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল) পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। (অতএব হাযিরার জন্য তোমরা স্বীয় কার্যকলাপ ঠিক রাখ এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করো না)।

সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ

ভূমিকা

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্য় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কুরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার করে নিতে হবে–

*** কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে**

*** এবং দেখতে হবে সুদ কোন্ কোন্ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত**

*** এর অবৈধতা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর্ ভিত্তিশীল**

*** এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান?**

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধ্বসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিষ্কসমূহের উদ্ভট চিন্তার ফসল? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে– শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

সুদখোরের করুণ পরিণতি

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন আছর করে উন্মাদ ও দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জ্বিন ও শয়তানের আছরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) লিখেছেন ঃ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জ্বিন ও শয়তানের আছরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোররা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উত্থিত হবে–কুরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামি ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ শয়তান আছর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না; তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচালিত হবে।

সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশত অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তি কোন প্রকার কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। সুদখোরদের অবস্থা এরূপ হবে না। তারা ভূতে-ধরা লোকের মত কষ্ট ও শাস্তি পুরোপুরিই অনুভব করবে।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে কিনা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেওয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উত্থিত করার

মধ্যে সম্ভবত এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায় অজ্ঞান ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায় উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেওয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠানো হবে।

সুদ খাওয়ার অর্থ

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা। চাই খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তা-ই।

শাস্তির কারণ

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। তারা দু'টি অপরাধ করেছে ঃ

এক. সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে।

দুই. সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছে ঃ "ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।" অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ বলার উত্তর

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে?

এর জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেনদেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে জওয়াব দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেওয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে–সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা না-ই করুক। কেননা, সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয় কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

সুদ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তাওবা করেছে– তার এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

মনেপ্রাণে তাওবা করে থাকলে আল্লাহ্র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তাওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ

ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্য (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্ হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিকে (অর্থাৎ সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।

সুদ ও সাদকাকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পরবিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পরবিরোধী। আর সাধারণত যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে।

স্বরূপের বিরোধ

স্বরূপের বিরোধ এই যে, সাদাকা ও খয়রাত কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেওয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেওয়া হয়।

নিয়তের বিরোধ

এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাওয়াবের জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উগ্র বাসনা পোষণ করে থাকে।

ফলাফলের বিরোধ

পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও উপকারিতা বেড়ে যায়।

সুদকে মেটানো সাদাকাকে বাড়ানোর ব্যাখ্যা

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তিলাভের উপায়-উপকরণ হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তাফসীরকারগণ বলেন, সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসায়-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষনিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক, তা সাধারণত স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন-না-কোন বিপর্যয়ের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (রহ.) বলেন, আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না (এবং কাপড়-চোপড় ও থালা-বাসনের কাজও দেয় না।) তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন

করার উপায় যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সন্তান-সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এবার সুদের কারবারও দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ বর্ধিষ্ণুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুরই বার্তাবহ। এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশি। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাবপত্রেরও তাদের অভাব নেই। নফর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম ও আরামের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় উৎপাদিত এবং তা বাজারেও বিক্রি হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় উৎপাদিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রি হয় না। তা এমন একটি রহমত যা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা

অর্জিত হয় না। এক নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্য মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাবপত্র সুদৃশ্য ও মনোহরী করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়। কিন্তু এতসব সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবে–যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। আমেরিকার মত সম্পদশালী সভ্য দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বটিকা ব্যবহার না করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বটিকাও তাদের ঘুম আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তা-ই।

বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর সুদখোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। তারা এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় এমন বিভোর থাকে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে, ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসছে-এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। আফসোস, এ পাগলরা সুখের সাজ-সরঞ্জামকেই সুখ মনে করে নিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন এদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন।

বলা বাহুল্য, সুদখোররা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইয্যত ও সম্ভ্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রোপ্য দ্বারা যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্বলোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধবিগ্রহ এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের

ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফল। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনকেও কখনো সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হলে এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবত কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপঃ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজ দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ ও সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লাই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে ঐসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদের অর্ধমৃত করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদমখোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটাতাজা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে। এর বিপরীত দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদের কখনও ধন-সম্পদের পিছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থৈর্য তারা অনেকগুণ বেশি ভোগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

সুদকে নিশ্চিহ্ন করার অর্থ

মোটকথা, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কারই; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই।

إِنَّ الرِّبٰوا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلٰى قُلٍّ

অর্থাৎ সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা।

(মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফির গোনাহগারকে পছন্দ করেন না। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায়, তারা গোনাহগার, পাপাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি এবং লাঞ্ছনার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। তাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকর্মী তথা নামায ও যাকাত আদায়কারীদের ছওয়াব ও পরকালীন মর্তবা উল্লেখ করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ এই আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, এ আয়াতে সেগুলোর লেনদেনও হারাম করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের বকেয়া সুদের দাবী তখনো অন্যদের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী সাকীফ ও বনী মাখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী সাকীফের কিছু সুদের দাবী তখন পর্যন্ত বনী মাখযুমের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী মাখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আবার এদিকে বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে থাকে কারণ, তারা মুসলমান ছিল না; কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী মাখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররমা। তখন মক্কা বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আয (রাযি.)। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব ইবনে উসায়দ (রাযি.)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কুরআন পাকের আলোচ্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে। এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিৎ নয়। তিনি এ ভাষণে বলেনঃ

اَلَا اِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ. لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ وَاَوَّلُ رِبًا مَوْضُوْعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُلُّهُ.

অর্থাৎ, জাহিলিয়াত যুগে সুদের যেসব লেনদেন হয়েছে, সবগুলোর সুদ ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন প্রত্যেকেই মূলধন পাবে। সুদের অতিরিক্ত অংক পাবে না। তোমরা সুদ আদায় করে আর কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। সর্বপ্রথম যে সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ। এ সুদের বিরাট অংক অমুসলিমদের কাছে প্রাপ্য ছিল। কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) আদেশ দ্বারা আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এরপর আসল বিষয়ের নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিশেষ

পদ্ধতির মাধ্যমেই কুরআন পাক সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল সংবিধানের তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন মনে হয়- যখনই এরূপ কোন আইন কুরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই আগে পরে আল্লাহ্‌র সামনে হাযিরা, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তি অথবা ছওয়াবের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন-মানসকে তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এরপর নির্দেশ শুনানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অতীত সুদের অঙ্ক ছেড়ে দেওয়া মানবমনের পক্ষে কঠিন হতে পারত। তাই আগে اِتَّقُوا اللّٰهَ বলে এরপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا অর্থাৎ বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করাই ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে اِتَّقُوا اللّٰهَ এবং নির্দেশের পরে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কুরআন পাকে এতবড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এআয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর জুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন দেওয়াকে তাওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তাওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন পাবে।

এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধনও পাবে না। এ মাসআলার বিবরণ এই যে, যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারামই মনে না করে, উপরন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাওবা না করে, তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী-মুরতাদ। মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীর ধন-সম্পদ তার

মালিকানায় থাকে না। মুসলমান অবস্থায় সে যা উপার্জন করে, তা তার মুসলমান ওয়ারিশগণ পায়। আর কুফর অবস্থায় অর্থাৎ, মুরতাদ হওয়ার পর যা উপার্জন করে তা বাইতুল মাল তথা সরকারী ধনাগারে জমা হয়। তাই সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাওবা না করা যদি হলাল মনে করার কারণে হয়, তবে আসল মূলধনও সে ফেরত পাবে না। আর যদি হারাম মনে করেও কার্যত সুদ থেকে বিরত না হয় এবং দল গঠন করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরও সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী ধনাগারে আমানত হিসেবে জমা করা হয়। যখন সে তাওবা করে তখন আবার সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়। বস্তুত এ জাতীয় সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই শর্তের আকারে বলা হয়েছে-

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের বিপরীতে পূত-পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ তোমার খাতক যদি রিক্তহস্ত হয়-ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম। সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিৎ। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কুরআন পাক সাদাকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্য সাদাকা হয়ে যাবে

এবং বিরাট ছওয়াবের কারণ হবে। এছাড়া আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। অথচ বাহ্যত এতে তাদের ক্ষতি। কারণ, সুদ তো ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল, এখন মূলধনও গেল। কিন্তু কুরআন পাক একে উত্তম বলেছে এর কারণ দ্বিবিধঃ

এক. এটা যে উত্তম, তা এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর চোখের সামনে এসে যাবে। তখন এ সামান্য অর্থের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হবে।

দুই. এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কার্যের কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত হবে। বরকতের স্বরূপ এই যে, অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা অধিক কাজ সাধিত হবে। এর জন্য ধন-সম্পদের পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়ে যাওয়া জরুরী নয়। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদে অপরিসীম বরকত হয়। তাদের অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা এত অধিকতর কাজ সাধিত হয় যে, হারাম মালের অধিকারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দ্বারা তত কাজ সাধিত হয় না। বরকতহীন ধন-সম্পদের অবস্থা এই যে, যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তা অর্জিত হয় না কিংবা উদ্দেশ্য নয়- এমন কাজেই তা অধিক ব্যয় হয়ে যায়। যেমন, ঔষধপত্র, চিকিৎসা এবং ডাক্তারের ফি ইত্যাদি। এসব কাজে ধনীদের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। গরীবদের এগুলোর দরকার খুব কমই হয়ে থাকে। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন। ফলে চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার বড় একটা প্রয়োজনই তাদের জন্য দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলেও মামূলী খরচেই তাদের জন্য সুস্থতা অর্জিত হয়ে যায়। এ হিসাবে নিঃস্ব খাতককে কর্জ মাফ করে দেওয়া বাহ্যত অলাভজনক দেখা গেলেও কুরআনের এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ একটি উপকারী ও লাভজনক কাজ।

নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্রতার শিক্ষাসম্বলিত কতিপয় সহীহ হাদীস

* তিবরানীর এক হাদীসে আছে- যেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া মাথা গুঁজবার কোন ছায়া পাবে না সেদিন যে ব্যক্তি তার মাথার উপর আল্লাহ্র রহমতের ছায়া কামনা করে, তার উচিৎ নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্র ব্যবহার করা কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া। সহীহ মুসলিমেও এ বিষয়ের হাদীস রয়েছে।

* মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে, সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সাদাকা করার ছওয়াব পাবে। দেনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সময় দেওয়ার জন্য হবে এ হিসাব। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সাদাকা করার ছওয়াব পাবে।

* এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি চায় যে তার দুআ কবূল হোক কিংবা বিপদ দূর হোক, তার উচিৎ নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেওয়া।

এরপর শেষ আয়াতে পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরে হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আযাব উল্লেখ করে সুদ সংক্রান্ত এ আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

অর্থাৎ ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে হাযিরার জন্য আনীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, অবতরণের দিক দিয়ে এটি সর্বশেষ আয়াত। এরপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একত্রিশ দিন পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে নয় দিন পর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের কথা বর্ণিত আছে। এ পর্যন্ত সুদের বিধি-বিধান সম্পর্কিত সূরা বাকারার আয়াতসমূহের তাফসীর বর্ণিত হলো।

দশ আয়াতে সুদের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে

সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন পাকে সূরা বাকারায় সাত আয়াত, সূরা আলে-ইমরানে এক আয়াত এবং সূরা নিসায় দু'টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা রূমেও একটি আয়াত আছে, যার তাফসীর নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এভাবে কুরআন পাকের দশটি আয়াতে সুদের বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। সুদের পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্বে সূরা আলে-ইমরান, সূরা নিসা এবং সূরা রূমে উল্লিখিত অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও এ স্থলে করে দেওয়া সমীচীন মনে হয়। তাতে সবগুলো আয়াতই একত্র হওয়ার ফলে সুদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

সূরা আলে-ইমরানের ১৩০তম আয়াতটি এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ-"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে"।

(সূরা আলে ইমরান, ১৩০)

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়াত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ নীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের উপর বাকি দেওয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেওয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। সাধারণ তাফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন্‌নুকুল' গ্রন্থে মুজাহিদ রহ.-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লিখিত আছে। জাহিলিয়াত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (অর্থাৎ কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর

অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্তি না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাকারা ও সূরা নিসায় যে কোন ধরনের সুদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে; কয়েকগুণ বেশি হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا.

অর্থাৎ আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করো না।

(সূরা বাকারা, ৪১)

এতে 'অল্প মূল্য' বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্প মূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, বেশি মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি তাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

সুদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে একথাও বলা যায় যে, সুদের অভ্যাস গড়ে উঠলে সুদ শুধু সুদই থাকে না, বরং অপরিহার্যভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ক্রমবর্ধিত অস্তিত্ব পেয়ে যায়। কারণ, সুদের যে টাকা সুদখোরের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে অতিরিক্ত টাকাটিও পুনর্বার সুদেই খাটানো হয়। ফলে সুদ কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ম অব্যাহত থাকলে সুদের টাকা أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً অর্থাৎ কয়েকগুণেরও কয়েকগুণ হয়ে যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক সুদ পরিমাণে দিগুণ চতুর্গুণই হয়।

সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার দুটি আয়াত

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

অর্থাৎ- "ইহুদীদের এসব বড় বড় অপরাধের কারণে আমি অনেক পবিত্র বস্তু-যা তাদের জন্য হালাল ছিল- তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি এবং তা এ কারণে যে, তারা অনেক মানুষের সুপথ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে যেত এবং তা একারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো। অথচ তাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ

অন্যায়ভাবে গ্রাস করত। আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি"। (সূরা নিসা ১৬০-১৬১ আয়াত)

এ দু'আয়াত থেকে জানা গেলে যে, মূসা (আ.)-এর শরীয়তেও সুদ হারাম ছিল। ইহুদীরা যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন দুনিয়াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ তারা জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে হারাম খেতে শুরু করলে আল্লাহ্ তা'আলা কতক পবিত্র বস্তুও তাদের জন্য হারাম করে দেন।

সূরা রূমের ৩৯তম আয়াত ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

অর্থাৎ- "যে বস্তু তোমরা মানুষের ধন-সম্পদে পৌঁছে বেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাও, তা আল্লাহ্র কাছে বাড়ে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিলে যাকাত প্রদানকারী আল্লাহ্র কাছে তা বাড়িয়ে নেয়"।

(সূরা রূম ৩৯ আয়াত)

কোন কোন তাফসীরকার 'রিবা' শব্দ এবং বেড়ে যাওয়ার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আয়াতকে সুদের অর্থে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন- সুদ গ্রহণে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি নয়। উদাহরণত কারও দেহ ফুলে গেলে বাহ্যত তা দেহের বৃদ্ধি বলে মনে হলেও কোন বুদ্ধিমানই একে পুষ্টি ও বৃদ্ধি মনে করে আনন্দিত হয় না; বরং একে ধ্বংসের পূর্বাভাসই মনে করে। এর বিপরীতে যাকাত ও সাদাকা দেওয়ার মধ্যে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস নয়; বরং ধন-সম্পদের হাজারো প্রবৃদ্ধির কারণ। উদাহরণত কেউ কেউ পেটের দূষিত বস্তু বের করার জন্য জোলাপ ব্যবহার করে কিংবা শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করে নেয়। তার ফলে বাহ্যত সে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহে ভারশক্তির অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এ অভাব তার বল ও শক্তিরই অগ্রদূত।

কোন কোন তাফসীরবিদ এ আয়াতকে সুদ নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরেন নি। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদ অপরকে আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নয়; বরং প্রতিদানে আরও বেশি পাওয়ার নিয়তে দেয়, তা বাহ্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয় না। উদাহরণত অনেক সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে বর-কনেকে টাকা-পয়সা ও আসাবপত্র দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলো উপঢৌকন হিসাবে নয়, বরং প্রতিদান গ্রহণের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। এ দান যেহেতু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজ স্বার্থে হয়ে থাকে, তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এভাবে ধন-সম্পদ বাহ্যত ক্রমবর্ধমান হতে থাকলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। হ্যাঁ, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সব যাকাত ও সাদাকা দেওয়া হয়, তাতে বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পেলেও আল্লাহ্‌র কাছে তা দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে যায়। এ তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তু-

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.

আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ আপনি প্রতিদানে অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করার নিয়তে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।

(সূরা মুদ্দাসসির ৬ আয়াত)

সূরা রূমের আলোচ্য আয়াতে বাহ্যত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য মনে হয়। প্রথম কারণ এই যে, সূরা রূম মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য, একারণে যদিও প্রত্যেকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল ধারণা অবশ্যই জন্মে। আয়াতটি যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে একে সুদ নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরে নেওয়া যায় না। কেননা, সুদের নিষেধাজ্ঞা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়বস্তু দ্বারাও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۡ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ- আত্মীয় স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম। তারাই সফলকাম। (সূরা রূম, ৩৮ আয়াত)

এ আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ব্যয় করা হলেই আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা ছওয়াবের কাজ হবে। অতএব, এর পরবর্তী আয়াতে এ শর্তের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রতিদানে বেশি পাওয়ার নিয়তে যদি কাউকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয়,

তবে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হলো না। কাজেই এর ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

মোটকথা, সুদের অবৈধতার প্রশ্নে এ আয়াতটি বাদ দিলেও পূর্বোল্লিখিত আরও অনেক আয়াত বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ সুদের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে এবং অবিশষ্ট সব আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদের অবৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। এ বিবরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হোক বা চক্রবৃদ্ধি হোক কিংবা একতরফা হোক সবই হারাম এবং হারামও এমন কঠোর যে, এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনান হয়েছে।

সুদ ও রিবা'র আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝান হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্তত করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথম : কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় রিবা'র স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি?

দ্বিতীয় : রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি?

তৃতীয় : সুদ বা 'রিবা' যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে চালু থাকবে?

'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা

একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও তার উত্তর

'রিবা' আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং কুরআন অবতরণের পূর্বে জাহিলিয়াত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেনদেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সূরা নিসার আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, 'রিবা শব্দ এবং এর লেনদেন তাওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তাওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেনদেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কুরআন পাক বলে যে, মূসা (আ.)-এর উম্মতের জন্য সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, অতএব এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে। এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা রিবা'র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাকারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে কিরাম 'রিবা' শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন; বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন সাহাবায়ে কিরাম তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা রিবার যাবতীয় লেনদেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতীতকালের কাজ-কারবারে মুসলমানদের যেসব সুদ অ-মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, মুসলমানরা তাও ছেড়ে দেন। অ-মুসলমানদের যেসব সুদ মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা তা পরিশোধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন- এ মাসআলা মক্কার প্রশাসকের কাছে উপস্থিত হলে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে

জিজ্ঞেস করেন। এর ফয়সালা সূরা বাকারার সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ অতীতকালের বকেয়া সুদের লেনদেনও অবৈধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, ইসলামী শরীয়তের একটি নির্দেশের কারণে তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন হাতছাড়া হবে? এ অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, এ নির্দেশের আওতাধীন শুধু অ-মুসলমানরাই নয়, মুসলমানরাও। উভয়ের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য। সেমতে সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর বিরাট অংকের সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়।

মোটকথা, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার সময় রিবা শব্দের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, সকলের কাছেই তার প্রকৃত অর্থ সুবিদিত ছিল। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেনদেন করতো, কুরআন তাকেই হারাম করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, দেশের আইন হিসাবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অর্ন্তভুক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারূকে আ'যম (রাযি.)-এর মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন। নতুবা আরবরা যাকে রিবা বলতো, সেই আসল রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও ব্যক্ত করেন নি।

আরবে প্রচলিত রিবা

আল্লামা ইবনে জারির রহ.-এর বর্ণনা

এবার আরবে প্রচলিত 'রিবা' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর রহ. মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, **জাহিলিয়াত আমলে প্রচলিত ও কুরআন নিষিদ্ধ 'রিবা' হলো কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মুলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা**। আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। হযরত কাতাদাহ (রহ.) এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২)

মুফাসসির আবু হাইয়্যানের বক্তব্য

স্পেনের খ্যাতনামা তাফসীরবিদ আবু হাইয়্যান গারনাতী রচিত 'তাফসীরে বাহরে মুহীত'-এও জাহিলিয়াত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এরূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেওয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেওয়াও জায়েয হওয়া উচিৎ। কুরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

এ বিষয়বস্তুই তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কাবীর ও রূহুল-মা'আনী প্রভৃতি বিশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে।

ইবনে আরাবী রহ.-এর বক্তব্য

ইবনে আরাবী রহ. আহকামুল কুরআনে বলেছেনঃ

اَلرِّبٰوا فِي اللُّغَةِ اَلزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ بِهٖ فِي الْاٰيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ (احكام القران ٢-١١٠)

অর্থাৎ, অভিধানে রিবা শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে রিবা বলতে প্রত্যেক এমন অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝান হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই। (কেবল ঋণ ও তার মেয়াদ আছে।)

(আহকামুল কুরআনঃ ২য় খণ্ডঃ ১০১ পৃ.)

ইমাম রাযী রহ.-এর বক্তব্য

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ 'রিবা' দু'রকম, ক্রয়-বিক্রয়ের রিবা ও ঋণের রিবা। জাহিলিয়াত যুগের আরবে দ্বিতীয় প্রকার রিবাই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করতো এবং প্রতি মাসে তার মুনাফা আদায় করতো। নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায় না হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদও বাড়িয়ে দিত। জাহিলিয়াত যুগের সেই রিবাই কুরআন হারাম করেছে।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ.-এর বক্তব্য

ইমাম জাসসাস রহ. 'আহকামুল কুরআন'-এ রিবার অর্থ বর্ণনা করে বলেন-

هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ.

অর্থাৎ, এ এমন ঋণ, যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেওয়া হয় যে, খাতক তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশি পরিমাণ অর্থ ফেরত দেবে।

রিবার সংজ্ঞা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শব্দে

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিবার সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন-

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاءٌ.

অর্থাৎ যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তাই-রিবা। (জামে সগীর)

আলোচনার সারাংশ

মোটকথা, কাউকে ঋণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা। জাহিলিয়াত আমলে তা-ই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত একে সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছে। এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম এ কারবার পরিত্যাগ করেন এবং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইনগত বিধি-বিধানে একে প্রয়োগ করেন। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে কেউ সন্দিগ্ধতারও সম্মুখীন হয়নি।

তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণত তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হাতে হওয়া দরকার। কম-বেশি কিংবা বাকি হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর।

আরবে কাজ-কারবারে 'মুযাবানা' ও মুহাকালা[১] নামে কয়েকটি প্রকার প্রচলিত ছিল। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। (ইবনে কাসীর)

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে? হযরত ফারূকে আযম (রাযি.) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন।

اِنَّ اٰيَةَ الرِّبٰوا مِنْ اٰخِرِ مَا نُزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ قَبْلَ اَنْ يُّبَيِّنَهُ لَنَا فَدَعُوْا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ. (احكام القران للجصاص. صـ وتفسير ابن كثير بحواله ابن ماجه: ١/٣٢٨)

অর্থাৎ, সুদের আয়াত হচ্ছে কুরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত।

(আহকামুল কুরআন, জাসসাস পৃ. ৫৫১, ইবনে কাসীর, ইবনে মাজাহ সূত্রে, ১/৩২৮)

---

১. বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে 'মুযাবানা, বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশষ্য; যথা-গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথাঃ গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে 'মুহাকালা' বলা হয়। যেহেতু অনুমানে কম বেশি হওয়ার আশংকা থাকে তাই এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে।

হযরত ফারুকে আযম (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ঐসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহিলিয়াত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল 'রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারূকে আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

হযরত ফারুকে আযম রাযি.-এর প্রশ্নে পাশ্চাত্যপন্থীদের অবৈধ ব্যাখ্যা

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে মোহগ্রস্ত, তারা ফারূকে আযম (রাযি.)-এর উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, রিবার অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত তার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আহকামুল কুরআন এ ইবনে আরাবী (রহ.) এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারূকে আযম (রাযি.)-এর উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ مُجْمَلَةٌ فَلَمْ يَفْهَمْ مَقَاطِعَ الشَّرِيْعَةِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ إِلٰى قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ بِلُغَتِهِمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ تَيْسِيْرًا مِنْهُ بِلِسَانِهِ وَلِسَانِهِمْ وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ الرَّبَاوَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ.

অর্থাৎ, যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছে, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বুঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে এমন একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন তিনি নিজেও সে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্য তাদেরই ভাষায় তা অবতারণ করেছেন। তাদের ভাষায় রিবা শব্দের অর্থ

অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী (রহ.) তাফসীরে কাবীরে বলেন, 'রিবা' দুরকম–

(এক) বাকি বিক্রয়ের রিবা এবং

(দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়ার রিবা।

প্রথম প্রকার জাহিলয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা রিবার অন্তর্ভুক্ত। আহকামুল কুরআন জাসসাসে বলা হয়েছে ঃ রিবা দুরকম, একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহিলিয়াত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেওয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম ত্বাহাবী রহ.-এর বক্তব্য

ইমাম ত্বহাবী রহ. 'শরহে মা'আনিল-আছার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেনঃ কুরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা ঋণের উপর নেওয়া হতো। জাহিলিয়াত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নাত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয়ও জানা যায়, যা বিশেষ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের কম-বেশি করা কিংবা বাকি দেওয়ার পরিবর্তে নেওয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিক্‌হবিদরা পরস্পরে মতভেদ করেন। (শরহে মা'আনিল আছার ২৩২/২)

হযরত শাহ অলিউল্লাহ্ রহ.-এর বক্তব্য

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ' গ্রন্থে বলেনঃ "এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশি নেওয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয়।

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ (رواه البخاري)

অর্থাৎ রিবা বা সুদ শুধু বাকি দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে, সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকি দিয়ে মুনাফা নেওয়াকেই বলা হয়। এছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

এ বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছেঃ

১. কুরআন অবতরণের পূর্বে রিবা একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। ঋণের ওপর মেয়াদের হিসাবে বেশি নেওয়াকে রিবা বলা হত।

২. কুরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম তা বর্জন করেন। এর অর্থ বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়নি।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ে সমান হওয়া শর্ত। কম-বেশি হলে এবং বাকি দিলে রিবা হয়ে যাবে। এ ছয় বস্তু হলো সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর। এ আইনের অধীনেই আরবে প্রচলিত 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্তব্যের মাঝে বুঝবার ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল এই যে, এ নির্দেশ বর্ণিত ছয়টি বস্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য বস্তুতেও বিস্তার লাভ করবে? যদি তাই করে, তবে তা কোন বিধি অনুসারে? এ বিধির ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণ চিন্তা-ভাবনা ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এ বিধি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক বর্ণিত হয়নি, তাই হযরত ফারূকে আযম (রাযি.) আফসোস করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এর কোন বিধি বর্ণনা করে দিলে কোনরূপ সন্দেহ বাকি থাকতো না। এরপর তিনি বলেছেন যে, যেখানে সুদের সন্দেহও হয় সেখান থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

৪. জানা গেল, আরবে পরিচিত সুদই ছিল আসল ও সত্যিকার 'রিবা এবং একে ফিকহবিদগণ 'রিবাল-কুরআন' বা 'রিবাল-কর্জ' নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ ঋণের উপর মেয়াদের হিসাবে মুনাফা নেওয়া। হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সুদ প্রথম প্রকারের সুদের সাথে যুক্ত এবং একই

নির্দেশের আওতাভুক্ত। মুজতাহিদগণের মধ্যে যত মতভেদ হয়েছে, সব দ্বিতীয় প্রকার সুদের মধ্যেই হয়েছে। প্রথম প্রকার সুদ অর্থাৎ রিবাল-কুরআন যে হারাম, এ ব্যাপারে উম্মতে-মুহাম্মাদীর মধ্যে কখনো কোন মতভেদ হয়নি। **আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কুরআনের সাতটি আয়াত, (সব মিলিয়ে প্রায় দশখানা আয়াত) চল্লিশটিরও বেশি হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।**

দ্বিতীয় প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচলন নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই। এ পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ্য় সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রথম বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা

এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ সাব্যস্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্ট বস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যে, যাতে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন-না-কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশি এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কুরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে কিন্তু গোনাহ্র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না; বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রুপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত মারাত্মক। প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার

ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভিতরে থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধু তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে। এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায় তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না, যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া, যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কারও সতর্ক করার দরুণ যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না। বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব স্বভাবের রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ তিক্তকে মিষ্ট মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়। কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়; বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়; বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের

কাজ এ সময়েও এছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে। আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না- তাঁরা এর পরোয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মান্যকারী কে ছিল?

সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে; কিন্তু বাস্তব সত্য আজও কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্ট ক্ষত, যা প্রতিনিয়ত তাকে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কী? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব বিচক্ষণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটিকতক পুঁজিপতি জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং জাতির রক্তশোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্য আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেল এবং দেখাল যে, এরা কেমন মোটা-তাজা সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ। কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বলবে, তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় গিয়ে দেখ। সেখানে দেখবে শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত ও মাংস খেয়ে খেয়ে এ হিংস্ররা লালিত হচ্ছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্পীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা

সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়– এছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবে এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কীভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও অধুনালুপ্ত পদ্ধতি এমন বিশ্রী ছিল যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে-যাতে এদের অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্য ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে-যাকে ব্যাংক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধূলি দেওয়ার জন্য বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতির উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজ টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং পতিতাবৃত্তির আড্ডাগুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্র বিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেওয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতি-শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্য এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাংক (একাউন্ট) ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্য কোন মজুরি কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমত তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ন বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাংক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশগুণ বেশি টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশগুণ বেশি দিয়ে দেবে। এক লাখ দূরের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকার মালিক। সাথে ব্যাংকের নয় লাখ টাকার পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে। যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও সুবিধাসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ব্যাংকের সুদী ঋণের ক্ষতিসমূহ

১. জাতির প্রতি এটা কত বড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা বখশিশ হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

২. এর চাইতেও বড় দ্বিতীয় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পতিত হয়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট

মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সবাই ব্যক্তিগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা ভালো হলে অন্যরাও সাহস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেত। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়ত। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেনা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

৩. ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাংক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল।

যদি ব্যাংক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাংক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যেই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতি জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো।

৪. সুদের আরও একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন তার পুনরায় মাথা তোলার যোগ্যতা থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরদাশত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, তদুপরি ব্যাংকের ঋণও চেপে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয়, ঋণী হয় না।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে তুলা ব্যবসায়ে কুরআনের ভাষায় 'মুহাক' তথা অবক্ষয়ের বিপদ দেখা দেয়। সরকার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে সামাল দেন। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, এটা ছিল সুদের অশুভ পরিণতি। তুলা ব্যবসায়ীরা এ কারবারের অধিকাংশ পুঁজি ব্যাংকের ঋণ থেকে বিনিয়োগ করেছিল। নিজস্ব পুঁজি ছিল নামে মাত্র। আল্লাহ্‌র মর্জিতে তুলার বাজারে এমন মন্দা দেখা দেয় যে, দর ১২৫ থেকে ১০ টাকায় নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ (মার্জিন) পূর্ণ করার জন্য টাকা ফেরত দেওয়ারও যোগ্য ছিল না। তারা বাধ্য হয়ে তুলার বাজার বন্ধ করে দিল। সরকারের কাছে তারা দরখাস্ত করার পর সরকার ১০ এর পরিবর্তে ৯০ টাকা দরে মাল কিনে নিল এবং কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে দেউলিয়াত্বের কবল থেকে উদ্ধার করে নিল। সরকারের টাকা কার ছিল? দরিদ্র জনগণেরই। মোটকথা, ব্যাংকসমূহের কারবারের পরিষ্কার ফল এই যে, জনগণের পুঁজি দ্বারা গুটিকতেক লোক মুনাফা উপার্জন করে এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা জনগণের ঘাড়েই চাপে।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল

সুদরে মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয়। সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কুরআনের উক্তি يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا অক্ষরে অক্ষরে সত্য অর্থাৎ মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা অপরটি স্টক এক্সচেঞ্জ। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে।

১. একটি দৈব-দূর্বিপাক যথা জাহাজ ডুবে যাওয়া, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং

২. অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নিচে নেমে আসা।

বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয় জাতির যৌথ সম্পদ তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির ক্ষতি বেশি হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে, যাতে ব্যাংকের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয়।

জনগণ মনে করে বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত, ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়; কিন্তু এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে-মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়।

অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্য গোটা মানব সামজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হ্যাঁ, গুটিকতেক ধনীর ধন-সম্পদ এর বদৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই এর ফলাফল। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনের আনা করা হয়েছে, যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত আছেন। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যে

در بہ بست ودشمن اندر خانہ بود

অর্থাৎ শত্রুকে ভিতরে রেখেই গৃহের দরজা এঁটে দেওয়ার মত হয়ে গেছে।

ধন-সম্পদ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণ শুধু সুদের ব্যবসায় এবং জাতীয় সম্পদ দ্বারা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্যায় মুনাফাখোরী। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ না করা হবে এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না করা হবে, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর

এ স্থানে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু-না-কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে, বৃহৎ পুঁজিপতিরা এর দ্বারা বেশি উপকৃত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের মতই হবে অর্থাৎ জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে ভুগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক ধনীকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজি-করের আকারে যাকাতের বিধান আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নিচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয়

এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে যে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্য সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ

থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে; বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে।

সুদের আত্মিক ক্ষতি

এ পর্যন্ত সুদের অর্থনৈতিক ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হলো। এবার সুদের কারবার মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক অবস্থার উপর কিরূপ অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

১. মানবচরিত্রে সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

২. সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

৩. সুদ খাওয়ার ফলে অর্থলালসা বেড়ে যায়। সে এতে এমনই মত্ত হয় যে, ভাল মন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না?

সুদের স্বরূপ এবং এর জাগতিক ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্য় এ সম্পর্কিত কঠোর নিষেধাজ্ঞার কথা জানা গেল। কিন্তু বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পিতল্পা গুটানো। এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়।

কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা অবশ্যই প্রয়োজন।

কুরআন পাকেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলেন নি। (সূরা হাজ্জ, ৭৮ আয়াত)

তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল। সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্য কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছুসংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।[১ ও ২]

---

১. বেশ কিছু দিন পূর্বে কয়েকজন আলেমের পরামর্শক্রমে আমি সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। কোন কোন ব্যাংক-বিশেষজ্ঞ একে বর্তমান যুগে বাস্তবায়নযোগ্য বলেও স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ একে শুরু করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকাও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়ীদের আনুকূল্য এবং সরকারী মঞ্জুরির অভাবে চালু হতে পারেনি।

২. আলহামদু লিল্লাহ! বেশ কয়েক বছর যাবত এ ধরনের সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে আরো সতর্কতা ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। (সংকলক)

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামেই পূর্ব থেকে যাকাত ও ওয়াজিব সাদাকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতের ধারে-কাছেও যায় না। যারা যাকাত দেয় তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করার নির্দেশ দেননি– তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে।

সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছিয়ে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়া প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না।

যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়, এর অধীনে বায়তুলমাল থেকে প্রত্যেক অভাবগ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশি টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্হ।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ কাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'-চার-দশজনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না।

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি

১. মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সরকারসমূহকে এদিকে আকৃষ্ট করা। কেননা, তারাই এ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে এবং তাদের উদ্যোগ শুধু মুলমানদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকেই সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

২. কমপক্ষে সবার জ্ঞান বিশুদ্ধ হোক এবং তারা রোগকে সত্যিকারভাবেই রোগ মনে করুক। কেননা, হারামকে হালাল মনে করা আরেকটি গোনাহ্। এটা সুদের গোনাহ্র চাইতেও বড় ও মারাত্মক। তারা কমপক্ষে এ গোনাহে লিপ্ত না হোক। গোনাহে কিছু-না-কিছু বাহ্যিক উপকারও আছে। কিন্তু যেটা জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত গোনাহ্ অর্থাৎ হারামকে হালাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করা, এটা প্রথম গোনাহ্র চাইতেও মারাত্মক এবং নিরর্থক। কেননা সুদকে হারাম মনে করা এবং স্বীয় গোনাহ্ স্বীকার করার মধ্যে কোন আর্থিক ক্ষতিও হয় না। এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করার ফল এটা অবশ্যই যে, কোন সময় তাওবা করার তাওফীক হলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করা যাবে।

এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উপসংহারে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। এগুলো সুদ সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য, গোনাহ্ যে গোনাহ্–এ অনুভূতি জাগ্রত হোক, এ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা হোক, কমপক্ষে হারামকে হালাল করে এক গোনাহ্কে দুই গোনাহ্ না করুক। বড় বড় নেককার ও দ্বীনদার মুসলমান রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদ ও যিকিরে অতিবাহিত করে। সকাল বেলায় যখন তারা দোকানে কিংবা কারখানায় পৌঁছে, তখন এ কল্পনাও তাদের মনে জাগে না যে, তারা সুদ ও জুয়ার কাজ-কারবারে লিপ্ত হয়ে মারাত্মক কিছু গোনাহ্ করে চলছে।

সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী

১. সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বিরত থাকো

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّابِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. البخاري: (٣٨٨/١) رقم الحديث: (٢٧٦٦) مسلم: (٦٤/١) رقم الحديث: (٨٩)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেগুলো কি? তিনি বললেন ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (ইবাদতে কিংবা তাঁর বিশেষ গুণাবলীতে) অন্য কাউকে অংশীদার করা।

(২) যাদু করা। (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) এতীমের মাল খাওয়া। (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। এবং (৭) কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

-(বুখারী : ১ : ৩৮৮, হাদীস নং : ২৭৬৬ মুসলিম : ১: ৬৪, হাদীস নং : ৮৯)

২. রক্তের নদী ও প্রস্তর নিক্ষেপ

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ

بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا البخاري (١/٢٨٠) رقم الحديث (٢٠٨٥)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আজ রাতে দেখেছি দু'ব্যক্তি আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেলো। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হলে একটি রক্তের নদী দেখলাম। নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে দণ্ডায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায় চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে ওঠার চেষ্টা করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার সাথে একই আচরণ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি এ কি ব্যাপার দেখছি? তারা বলল, রক্তের নদীতে বন্দী ব্যক্তি সুদখোর। সে স্বীয় কার্যের শাস্তি ভোগ করছে।

–(বুখারী : ১ : ২৮০, হাদীস : ২০৮৫)

৩. সুদখোরের প্রতি অভিশাপ

(٣) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. مسلم (٢ /٢٧) رقم (١٥٩٨) وفي رواية أحمد (إذا علموا به) (١/٤٠٩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, (সুদের) দলীল লেখক ও সাক্ষ্যদাতা এদের সকলের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। আর বলেছেন, এরা সবাই সমান (অপরাধী)।(মুসলিম ২/২৭, হাদীস ১৫৯৮)

মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে এসেছে– 'যদি তারা অবগত থাকে' (অর্থাৎ দলীল লেখক ও সাক্ষ্যদাতার প্রতি অভিশাপ তখনই, যদি তাদের জানা থাকে যে, এটা সুদী কারবার।) (মুসনাদে আহমাদ : ১ : ৪০৯)

৪. চার শ্রেণীর লোক বেহেশতে যাবে না

(٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ اَنْ لَايُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَايُذِيْقَهُمْ نَعِيْمًا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَآكِلُ الرِّبَا وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيْمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ. المستدرك على الصحيحين (٢/٣٧)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন না।

এ চার ব্যক্তি হলো ঃ

(১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি ।

(২) সুদখোর ।

(৩) অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী । এবং

(৪) পিতামাতার অবাধ্যতাকারী ।-(মুস্তাদরাক-হাকেম : ২ : ৩৭)

৫. সুদের গোনাহ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক

(٥) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا رِبًا فَهُوَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثِيْنَ زَنِيَّةً وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. اخرجه الطبراني في الكبير (١١/٩٤) (١١٢١٦) والاوسط (٣/٤٥١) (٢٩٦٨) وقال في المجمع (٥/٢١٢) وفيه ابو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَا اَلْاِسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ أبوداؤد رقم الحديث : (٤٨٧٦) مسند احمد (١٦٥١)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক দিরহাম সুদ খাওয়া তেত্রিশবার (কোন কোন বর্ণনায় ছত্রিশবার) ব্যভিচার করার চাইতে বড় গোনাহ্ । আর হারাম মাল দ্বারা যে মাংস গঠিত হয়, তার জন্য আগুনই যোগ্য । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ্ ।

-(তাবরানী : ১১ : ৯৪, হাদীস নং ১১২১৬,
আবু দাউদ : ৪৮৭৬, আহমদ : ১৬৫১)

৬. সুদ খাওয়া আল্লাহর আযাবকে দাওয়াত দেয়

(٦) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَي الثَّمَرَةُ حَتّٰى تُطْعِمَ وَقَالَ : (اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِيْ قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ. المستدرك على الصحيحين (٢/٣٧) (٢٢٦١)

খাওয়ারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন । তিনি আরও বলেছেন ঃ কোন জনপদে যখন ব্যভিচার ও সুদের ব্যবসা প্রসার লাভ করে, তখন সে জনপদ যেন আল্লাহ্র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায় । -(হাকেম : ২ : ৩৭, হাদীস : ২২৬১)

৭. সুদ মূল্যস্ফীতি ও ভীরুতার কারণ

(٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : (مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ) اخرجه الامام احمد بن حنبل في مسنده (٤/٢٠٥)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর শত্রুর ভয় ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে। –(মুসনাদে আহমদ : ৪ : ২০৫)

৮. পেটের ভেতর সাপ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ لَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقُ قَالَ عَفَّانُ : فَوْقِيْ فَاِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنُهُمْ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا). اخرجه الامام احمد بن حنبل في مسنده. (٢/٣٥٣)

৮. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মি'রাজের রাতে যখন আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন আমি উপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিবরাইল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা সুদখোর।

–(মুসনাদে আহ্মদ : ২ : ৩৫৩)

৯. যে গোনাহ মাফ হয় না

(٩) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اِيَّاكَ وَالذُّنُوْبَ الَّتِيْ لَاتُغْفَرُ) اَلْغُلُوْلَ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتٰى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَكْلَ الرِّبَا فَمَنْ اَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوْنًا يَتَخَبَّطُ ثُمَّ قَرَأَ (اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا

كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. المعجم الكبير للطبراني (١٨/٦٠) (١١٠)

قال في المجمع (٤/١١٩) وفيه الحسين بن عبد الاول وهو ضعيف

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওফ ইবনে মালেক (রাযি.) কে বললেন, যে সব গোনাহ মাফ করা হয় না সেগুলো থেকে বাঁচো।

(১) গনীমতের মাল চুরি করা। গনীমতের মাল হতে যে চুরি করবে কেয়ামতের দিন সে তা নিয়ে হাজির হবে।

(২) সুদ খাওয়া। যে সুদ খাবে সে কেয়ামতের দিন উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে উত্থিত হবে। তারপর তিলাওয়াত করলেন, (তরজমা) যারা সুদ খায় তারা (কবর থেকে) উঠবে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে, যাকে শয়তান আক্রান্ত করে বোধবুদ্ধি নষ্ট করে ফেলেছে। –(তিবরানী : ১৮ : ৬০, হাদীস : ১১০)

১০. ঋণগ্রহিতার হাদিয়া নিবে না

(١٠) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ يَحْيٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ اَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِيْ اِلَيْهِ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدَى إِلَيْهِ طَبْقًا فَلَا يَقْبَلْهُ اَوْ حَمَلَهُ دَابَّةً فَلَا يَرْكَبْهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَالِكَ السنن الكبري للبيهقي (٥/٣٥٠)

ইয়াযিদ ইবনে আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম : হে আবু হামযা! আমাদের মধ্যে অনেকে তার ভাইকে কর্জ দেয়। তারপর সে (করজগ্রহণকারী) তাকে কোন কিছু হাদিয়া দিতে চায় (এই হাদিয়া নেওয়া উচিত হবে কি?) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কাউকে কর্জ দেয়, তারপর সে (করজগ্রহণকারী) তাকে (খাদ্যভর্তি) থালা হাদিয়া দেয় তখন সে যেন তা গ্রহণ না করে কিংবা যদি তাকে নিজ বাহনে আরোহণ করাতে চায় তো সে যেন তাতে না চড়ে। তবে যদি আগে থেকেই তাদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক থাকে সেটা ভিন্ন। -বায়হাকী : ৫ : ৩৫০

(সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে; এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ কারণে তার হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত।)

[বিশেষ জ্ঞাতব্য : সুদের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও তার পার্থিব ভয়াবহ অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আয়াত ও দশখানা হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য এটা যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পর্ব

শরী'আর আলোকে সর্বপ্রকার সুদের হুরমত ও সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থায়নের রূপরেখা

শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ক্ষতি ও তার বিকল্প

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আজকের এই সেমিনারের জন্য যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে, তা হলো 'রিবা', যাকে উর্দুতে (এবং বাংলায়ও) 'সুদ' আর ইংরেজিতে Usury (ইউজারি) বা Interest (ইন্টারেস্ট) বলা হয়। আর খুবসম্ভব এই বিষয়বস্তুটিকে নির্বাচন করার উদ্দেশ্য হলো, এমনিতেই তো বর্তমানে সারা বিশ্বে সুদী অর্থব্যবস্থা চালু আছে। তদুপরি পশ্চিমা বিশ্বে – আপনারা যেখানে বাস করছেন – অধিকাংশ আর্থিক তৎপরতা সুদের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য মুসলমানদের প্রতি পদে পদে এই প্রশ্নটি এসে উপস্থিত হচ্ছে যে, আমরা কীভাবে লেনদেন করব এবং সুদ থেকে কীভাবে মুক্তি লাভ করব। তা ছাড়া বর্তমানে মানুষের মাঝে নানা ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ছড়ানো হচ্ছে যে, এ যুগে আর্থিক ক্ষেত্রে যে Interest (সুদ) চালু আছে, প্রকৃতপক্ষে তা হারাম নয়। কারণ, পবিত্র কুরআন যে 'রিবা'কে হারাম ঘোষণা করেছে, এই Interest তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সবগুলো বিষয়কে মাথায় রেখেই আমার জন্য এ বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে যে, Interest তথা সুদের বিষয়ে যেসব মৌলিক তথ্য আছে, আমি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও বিদ্যমান অবস্থার আলোকে আপনাদের সম্মুখে তা আলোচনা করব।

সুদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা

সবার আগে বুঝবার বিষয় হলো, 'সুদ'কে পবিত্র কুরআন যত বড় অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, সম্ভবত অন্য কোনো গুনাহকে এত বড় অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি। যেমন– মদ পান করা, শূকর খাওয়া, ব্যভিচার করা

ইত্যাদি অপরাধের জন্য পবিত্র কুরআনে এমন ধমকের শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যা সুদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

যেমন– সূরা বাকারায় আল্লাহপাক বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা তা না কর (সুদের বকেয়া না ছাড় এবং সুদের কারবার অব্যাহত রাখ), তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।'

(সূরা বাকরা, ২৭৮-২৮৯)

অর্থাৎ– সুদি মহাজনদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই যুদ্ধঘোষণা অন্য কোনো অপরাধের জন্য করা হয়নি। যেমন– যারা মদ পান করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। যারা শূকর খায়, তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। যারা ব্যভিচার করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু 'সুদ' সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা সুদের কারবার বর্জন না করবে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এত শক্ত ও কঠিন হুঁশিয়ারি সুদের ব্যাপারে উচ্চারিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এর জন্য এত কঠিন, এত শক্ত হুঁশিয়ারি কেন? এর বিস্তারিত জবাব ইনশাআল্লাহ সামনে জানা যাবে।

'সুদ' কাকে বলে?

কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে, 'সুদ' কাকে বলে, 'সুদ' জিনিসটা কী, 'সুদে'র সংজ্ঞা কী। পবিত্র কুরআন যে সময়ে 'সুদ'কে হারাম ঘোষণা করেছে, তখন আরবদের মাঝে সুদের লেনদেন একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিষয় ছিল। সে সময়ে সুদ বলতে যা বোঝানো হতো, তা হলো, প্রদত্ত ঋণের উপর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো প্রকারের অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা। যেমন– আজ আমি কাউকে ঋণ হিসেবে একশো টাকা প্রদান করলাম এই শর্তে যে, এক মাস পর সে আমাকে একশো দুই টাকা পরিশোধ করবে। এরই নাম 'সুদ'।

চুক্তি ব্যতিরেকে বেশি দেওয়া 'সুদ' নয়

আগেই স্থির করে নেওয়ার শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, যদি ঋণ দেওয়ার সময় অতিরিক্ত পরিশোধের কথা স্থির করে না নেওয়া হয়, তাহলে প্রদত্ত অর্থের বাড়তি দেওয়া সুদ হবে না। যেমন– আমি কাউকে একশো টাকা ঋণ প্রদান করলাম। আমি তার থেকে এই দাবি করলাম না যে, তুমি আমাকে একশো দুই টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতা নিজের খুশিতে আমাকে একশো দুই টাকা ফেরত দিল। তো এটা সুদ নয়। এটা হারাম নয়; বরং এটা জায়েয।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা

স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, তিনি যখন কারও নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, তখন পরিশোধ করার সময় কিছু বেশি দিতেন, যাতে ঋণদাতা খুশি হয়। কিন্তু বাড়তি আদান-প্রদানের কথা যেহেতু পূর্ব থেকে স্থির করা থাকত না, তাই এটা 'সুদ' হতো না। হাদীসের পরিভাষায় একে 'হুস্নুল কাযা' বা 'উত্তম পরিশোধ' বলা হয়। অর্থাৎ– উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করা, পরিশোধের সময় ভালো আচরণ করা এবং কিছু বেশি দেওয়া সুদ নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পর্যন্ত বলেছেন যে :

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

'তোমাদের মধ্যে ঋণপরিশোধের পন্থা যার যত সুন্দর, সে তত ভালো মানুষ।'

–বুখারী হাদীস নং ২২১৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৪৩, নাসায়ী হাদীস নং ৪৫৩৯

কিন্তু যদি ঋণ দেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত করে নেওয়া হয়, ফেরত দেওয়ার সময় অতিরিক্ত এত টাকাসহ দিতে হবে, একেই 'সুদ' বলা হয়।পবিত্র কুরআন একেই কঠোর ও শক্ত ভাষায় হারাম সাব্যস্ত করেছে। সূরা বাকারার প্রায় পৌনে দুই রুকু এই সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

পবিত্র কুরআন কোন 'সুদ'কে হারাম সাব্যস্ত করেছে?

অনেকে বলে থাকেন, পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকম। সে যুগে যারা ঋণ গ্রহণ করত, তারা গরিব মানুষ ছিল। তাদের কাছে রুটি-রুজির জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

অসুখ হলে তাদের কাছে চিকিৎসার অর্থ থাকত না। কেউ মারা গেলে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা থাকত না। ফলে গরিব মানুষগুলো কারও নিকট থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হতো। কিন্তু ঋণদাতারা বলত, আমরা তোমাদের ঋণ দেব বটে; কিন্তু শতকরা এত টাকা বেশি দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি মানবতাবিরোধী ছিল যে, একজনের ব্যক্তিগত একটি প্রয়োজন – তার পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই; এমতাবস্থায় তাকে সুদ ছাড়া ঋণ না দেওয়া অবিচার ও বাড়াবাড়ি ছিল বিধায় আল্লাহপাক 'সুদ'কে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু আমাদের এযুগে এবং বিশেষভাবে ব্যাংকগুলোতে সুদভিত্তিক যে লেনদেন হয়, সেগুলোতে ঋণগ্রহীতারা গরিব বা অভাবী হয় না। বরং অধিকাংশ সময় তারা বড় বিত্তশালী ও পুঁজিপতি হয়ে থাকে। তারা এজন্য ঋণ গ্রহণ করে না যে, তাদের ঘরে খাবার নেই বা পরনে কাপড় নেই কিংবা চিকিৎসা করাবার অর্থ নেই আর তার জন্য এরা ঋণ গ্রহণ করছে। বরং তারা এজন্য ঋণ গ্রহণ করছে যে, এই অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে এবং তার দ্বারা মুনাফা অর্জন করবে। এমতাবস্থায় ঋণদাতা যদি একথা বলে, তুমি আমার অর্থ তোমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লাভবান হও আর লাভের ১০ ভাগ আমাকে দিয়ো, তা হলে এতে দোষের কী আছে? এ সেই 'সুদ' নয়, পবিত্র কুরআন যাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে আজ এই যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Loan) সে যুগেও ছিল

তো বলা হচ্ছে, এই বাণিজ্যিক সুদ (কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট) ও এই বাণিজ্যিক ঋণ (কমার্শিয়াল লোন) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। বরং সে যুগে ব্যক্তিগত ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ঋণ নেওয়া হতো। কাজেই পবিত্র কুরআন সেই সুদকে কী করে হারাম ঘোষণা করতে পারে, সে যুগে যার অস্তিত্বই ছিল না। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে কেউ-কেউ বলে থাকেন, পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেটি গরিব-অসহায় জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত সুদ ছিল। আমাদের এই কারবারি সুদ হারাম নয়।

আকৃতির পরিবর্তনে প্রকৃতি বদলায় না

এই যুক্তির জবাবে আমাদের প্রথম কথা হলো, কোনো বস্তুর হারাম হওয়ার জন্য জরুরি নয় যে, বস্তুটি হুবহু ওই আকৃতিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বিদ্যমান থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন যখন কোনো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে, তখন সেই বস্তুটির একটি প্রকৃতি তার সামনে থাকে। কুরআন সেই প্রকৃতিকে হারাম সাব্যস্ত করে। চাই তার বিশেষ কোনো আকার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটি বুঝুন। পবিত্র কুরআন মদকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদের প্রকৃতি হলো, এটি এমন একটি পানীয়, যার মধ্যে নেশা থাকে। এখন যদি কেউ একথা বলতে শুরু করে যে, জনাব, এ যুগের হুইস্কি, বিয়ার ও ব্রান্ডি নবীজির যুগে ছিল না; কাজেই এগুলো হারাম নয়, তা হলে তার এই দাবি সঠিক বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, এই পানীয়গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ঠিক এই আকারে ছিল না বটে; কিন্তু প্রকৃতি, তথা 'বস্তুটি নেশাকর হওয়া' বিদ্যমান ছিল। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেশাকর বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কাজেই যে কোনো নেশাকর বস্তু চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে। চাই তার নাম ও আকার যা-ই হোক। নাম হুইস্কি হোক কিংবা বিয়ার। ব্রান্ডি হোক কিংবা কোকেন। নেশাকর বস্তুমাত্রই হারাম।

মজার একটি গল্প শুনুন

একটি মজার গল্প মনে পড়ল। হিন্দুস্তানে এক গায়ক ছিল। একবার সে হজে গেল। হজ সমাপনের পর মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে এক মনযিলে যাত্রাবিরতি করল। সেযুগে চলার পথে বিভিন্ন মনযিল থাকত। মানুষ সেসব মনযিলে রাত্রিযাপন করত এবং পরদিন সকালে সম্মুখপানে রওনা হতো। নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুস্তানি গায়ক রাত্রিযাপনের জন্য এক মনযিলে অবস্থান গ্রহণ করল। উক্ত মনযিলে এক আরব গায়কও গিয়ে উপস্থিত হলো এবং ওখানে বসে আরবিতে গান গাইতে শুরু করল। আরব গায়কের কণ্ঠ ছিল খানিক কর্কশ ও কাঠখোট্টা। হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে তার গান খুব বিশ্রী ও বিরক্তিকর ঠেকল। তাই সে বলে উঠল, আজ আমার বুঝে এসেছে, আমাদের নবীজি গান-বাজনাকে কেন হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। তার কারণ হলো, তিনি বেদুঈনদের বেসুরো ও কর্কশ গান শুনেছিলেন। তাই তিনি গানকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি যদি আমার গান শুনতেন, তা হলে গান-বাজনাকে তিনি হারাম ঘোষণা করতেন না।

আজকালকার মেজাজ

আজকাল মেজাজ তৈরি হয়ে গেছে, যেকোনো বিষয়ের ব্যাপারে মানুষ হুট করে বলে ফেলে, জনাব, নবীজির আমলে তো এই আমলটি এভাবে হতো আর সেজন্য তিনি তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আমলটি সেভাবে হয় না, তাই সেটি হারাম নয়। যারা এ ধরনের যুক্তির অবতারণা করে, তারা এমনও বলে থাকে যে, শূকরকে এজন্য হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, সেযুগে এই জন্তুটি নোংরা পরিবেশে পড়ে থাকত, আবর্জনা খেত এবং নোংরা পরিবেশে প্রতিপালিত হতো। কিন্তু শূকর এখন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাদের জন্য উন্নতমানের ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন শূকর হারাম হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

শরীয়তের একটি মূলনীতি

মনে রাখবেন, পবিত্র কুরআন যখন কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে, তখন তার একটি প্রকৃতি থাকে। তার আকৃতি যতই পরিবর্তিত হোক, তার প্রস্তুতপ্রণালী যতই বদলাতে থাকুক, প্রকৃতি তার আপন স্থানে বহাল থাকে এবং সেই প্রকৃতিটি-ই হারাম সাব্যস্ত হয়। এ হলো শরীয়তের মূলনীতি।

নববী যুগ সম্পর্কে একটি ভুল বোঝাবুঝি

তা ছাড়া একথাটিও যথাযথ নয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল না এবং সকল ঋণ কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করা হতো। এ বিষয়বস্তুটির উপর আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. 'মাসআলায়ে সূদ' (সুদের বিধান) নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। তার দ্বিতীয় খণ্ডটি আমি লিখেছি। তাতে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলেও বাণিজ্যিক ঋণের লেনদেন হতো।

যখন একথাটি বলা হয়, আরবরা মরুবাসী ছিল, তখন সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কে একটি কল্পনা এসে উপস্থিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে যুগে আগমন করেছিলেন, সেটি এমন একটি সরল ও সাধারণ সমাজ হয়ে থাকবে, যেখানে ব্যবসা বলতে কিছু ছিল না। যদি থাকেও তবে শুধু গম ও যব ইত্যাদির। আর তাও দশ-বিশ টাকার বেশির হতো না। এ ছাড়া বড় কোনো বাণিজ্য সেই সমাজে ছিল না। সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্কে এই ধারণাটি-ই বদ্ধমূল হয়ে আছে।

প্রতিটি গোত্র এক-একটি 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল

কিন্তু মনে রাখবেন, একথাটি সঠিক নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে আগমন করেছিলেন, সেই সমাজেও আজকের আধুনিক ব্যবসার প্রায় সব কটি প্রকারের ভিত্তি বিদ্যমান ছিল। যেমন– আজকাল 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' আছে। এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, এটি চতুর্দশ শতাব্দীর আবিষ্কার। এর আগে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'র কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু আমরা যখন আরবের ইতিহাস পাঠ করি, তখন দেখতে পাই, আরবের প্রতিটি গোত্র এক-একটি স্বতন্ত্র 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল। কারণ, প্রতিটি গোত্রে ব্যবসার পদ্ধতি এই ছিল যে, গোত্রের প্রতিজন মানুষ এক টাকা-দুটাকা করে একস্থানে সঞ্চয় করত এবং সেই অর্থ শাম প্রেরণ করে সেখান থেকে ব্যবসাপণ্য আমদানি করত।

আপনারা অনেক বাণিজ্যিক কাফেলার (Commercial Caravan)-এর নাম শুনে থাকবেন। এসকল কাফেলার কাজ এটিই হতো যে, গোত্রের সব মানুষ এক-একটি টাকা একত্রিত করে অন্যত্র পাঠাত আর সেখান থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজ অঞ্চলে এনে বিক্রি করত।

যেমন– পবিত্র কুরআনের সূরা কুরাইশে আল্লাহপাক সে যুগের 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'গুলোর বাণিজ্যিক তৎপরতারই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহপাক বলেন :

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

'যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের সফরের।' (সূরা কুরাইশ, আয়াত ১-২)

এই ব্যবসারই মিশন নিয়ে আরবের লোকেরা শীতকালে ইয়ামেন আর গ্রীষ্মকালে শাম (সিরিয়া) সফর করত। তাদের শীত-গ্রীষ্মের এই সফর শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হতো। এখান থেকে পণ্য নিয়ে ওখানে বিক্রি করত আর ওখান থেকে পণ্য এনে এখানে বিক্রি করত। কোনো-কোনো সময় এক-একজন মানুষ আপন গোত্র থেকে দশ লাখ দিনার পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করত। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি এজন্য ঋণ গ্রহণ করত যে, তাদের ঘরে খাওয়ার কিছু ছিল না? তাদের কাছে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবার মতো কাপড় ছিল না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এত বড় ঋণ তারা কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করত।

সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা সুদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে যখন সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন :

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

'জাহেলিয়াতের সুদ রহিত করা হলো। সবার আগে আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। তার সম্পূর্ণ সুদ রহিত করা হলো।'

–মুসলিম হাদীস নং ১২৩৭, আবু দাউদ হাদীস নং ১৬২৮

হযরত আব্বাস (রাযি.) সুদের উপর ঋণ দিতেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, আমি আমার চাচা আব্বাস-এর সম্পূর্ণ সুদ রহিত করে দিলাম। যার-যার কাছে তিনি সুদ পাওনা আছেন, সেগুলো আর পরিশোধ করতে হবে না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাযি.)-এর যে সুদ রহিত ঘোষণা করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল দশ হাজার মিছকাল সোনা। প্রায় চার মাশায় এক মিছকাল হয়। আর এই দশ হাজার মিছকাল মূলধন ছিল না। বরং এই পরিমাণটি ছিল সুদ, যা তিনি মানুষের কাছে পাওনা ছিলেন।

আপনারাই বলুন, যে বিনিয়োগের বিপরীতে দশ হাজার মিছকাল সোনা সুদ আসে, সেই ঋণ কি শুধু খাওয়া-পরার প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছিল? বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত ঋণ ব্যবসার জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল।

সাহাবাযুগে ব্যাংকিং-এর একটি দৃষ্টান্ত

হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাযি.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। তিনি হুবহু এ যুগের ব্যাংকিং সিস্টেমের মতো একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে আমানত রাখত, তখন তিনি বলে নিতেন, আমানতের এই অর্থ আমি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছি। তোমার এই অর্থ আমার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকল। তারপর এই অর্থকে তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতেন। এই ধারাবাহিকতায় মৃত্যুর সময় তাঁর দায়িত্বে যে ঋণ ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বলেন :

فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُّ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ

'আমি তাঁর ঋণগুলো হিসাব করে দেখলাম, তার পরিমাণ বাইশ লাখ দিনার।'

কাজেই সে যুগে বাণিজ্যিক ঋণ ছিল না একথাটি একেবারেই অবাস্তব ও ঐতিহাসিক ভুল। বাস্তবতা হলো, সেযুগে বাণিজ্যিক ঋণও ছিলো এবং তার উপর সুদের লেনদেনও হতো। পবিত্র কুরআন যেকোনো ঋণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই এই অভিমত ব্যক্ত করা সঠিক নয় যে, কমার্শিয়াল লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা জায়েয আর ব্যক্তিগত লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা না-জায়েয ।

'চক্রবৃদ্ধি সুদ' ও 'সরল সুদ' দু-ই হারাম

এ ছাড়া আরও একটি বিভ্রান্তি এই ছড়ানো হচ্ছে যে, এক হলো 'সরল সুদ' (Simple Interest) আরেক হলো 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' (Compound Interest)। 'চক্রবৃদ্ধি' মানে সুদের উপর সুদ আরোপ করা। কেউ কেউ বলে থাকেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' হতো। আর পবিত্র কুরআন এই সুদকেই হারাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' হারাম হলেও 'সরল সুদ' জায়েয। কারণ, 'সরল সুদ' সে যুগে ছিল না। আর না কুরআন তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু এই একটু আগে আমি আপনাদের সম্মুখে কুরআনের যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সুদের যা বকেয়া আছে, সেগুলো ছেড়ে দাও।' -সূরা বাকারা ২৭৮

এই আয়াতে আল্লাহপাক বকেয়া সুদের দাবি পরিত্যাগ করতে আদেশ করেছেন। 'সরল' আর 'চক্র'র কোনো উল্লেখ নেই। তারপর বলেছেন :

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ

'যদি তোমরা (সুদ থেকে) তাওবা করে নাও, তা হলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে।' সূরা বাকারা ২৭৯

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, তোমাদের মূলধন ঠিক থাকবে। এটি তোমাদের অধিকার। কিন্তু এর বাইরে সামান্যতম বাড়তিও হারাম। কাজেই একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে, 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' হারাম – 'সরল সুদ' হারাম নয়। বরং সুদ কম হোক কিংবা বেশি, সবই হারাম। ঋণগ্রহীতা যদি গরিব হয়, তবুও হারাম; যদি বিত্তশালী হয়, তবুও হারাম। যদি কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে, তবুও সুদ হারাম; যদি ব্যবসার জন্য

ঋণ করে, তবুও হারাম। সব ধরনের সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

বর্তমান ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সর্বসম্মতিক্রমে হারাম

এখানে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। তা হলো, বিগত ৫০-৬০ বছর যাবত মুসলিম বিশ্বে Banking Interest সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে আসছে। আর যেমনটি বলেছি, কিছু লোক বলছে, Compound Interest হারাম আর Simple Interest হালাল কিংবা বাণিজ্যিক লোন হারাম নয় ইত্যাদি। এসব প্রশ্ন ও অভিযোগ মুসলিম বিশ্বে প্রায় ৫০-৬০ বছর যাবত আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই আলোচনার এখন সমাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের শুধু আলেমগণই নন – অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম ব্যাংকারগণও এই সিদ্ধান্তে একমত যে, সাধারণ ঋণের উপর সুদ যেমন হারাম, ব্যাংকিং ইন্টারেস্টও তেমনই হারাম। এই সিদ্ধান্তের উপর এখন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের এতে কোনোই ভিন্নমত নেই। এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে জিদ্দায় 'আল-মাজ্‌মাউল ফিক্‌হিল ইসলামী'তে। তাতে প্রায় ৪৫টি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সমাবেশ ঘটেছিল। আমিও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রায় ২০০ আলেম সর্বসম্মতিক্রমে এই ফতোয়া প্রদান করেছিলেন যে, ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সম্পূর্ণ হারাম এবং তার জায়েয হওয়ার কোনোই পথ নেই। কাজেই এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এখন বাতুলতা বই কিছু নয়।

কমার্শিয়াল লোনের উপর ইন্টারেস্ট গ্রহণে সমস্যাটা কী?

আরও একটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার। তা হলো, আলোচনার শুরুতে যেমনটি বলেছিলাম যে, মানুষ বলছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা হতো। এখন যদি কোনো লোক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নেয় আর ঋণদাতা সুদ দাবি করে, তা হলে এটি অমানবিক আচরণ ও অবিচার বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু কেউ আমার অর্থ তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা করল আর আমি সেই মুনাফা থেকে একটি অংশ গ্রহণ করলাম, তাতে দোষের কী আছে?

আপনাকে লোকসানের ঝুঁকিও নিতে হবে

এর উত্তরে আমার প্রথম কথা হলো, একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর কোনো বিধানে প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ যদি

কোনো বস্তু বা বিষয়কে হারাম করে দিয়ে থাকেন, তা হলে তা হারাম হয়ে গেল। ইসলামের বিধান হলো, আপনি যদি কাউকে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে দেওয়ার আগে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি ঠিক করে নিন। আপনি কি তাকে সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন, নাকি তার কারবারে অংশীদার হতে চাচ্ছেন? আপনি যদি ঋণের মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করতে চান, তা হলে শুধু সহযোগিতা-ই করবেন। এমতাবস্থায় উক্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু দাবি করার কোনো অধিকার থাকবে না।

পক্ষান্তরে যদি আপনি তার কারবারে অংশীদার হতে চান, তা হলে যেভাবে আপনি তার লাভের অংশীদার হবেন, তেমনি আপনাকে তার ব্যবসায় লোকসানেরও অংশীদার হতে হবে। এমনটি হতে পারবে না যে, কারবারে লোকসানের ঝুঁকি সবটুকু তিনি বহন করবেন আর আপনি মুনাফা গণনা করবেন। এই পদ্ধতিতে আপনি তাকে ঋণ প্রদান থেকে বিরত থাকুন। আপনি বরং তার সঙ্গে একটি Joint Enterprise (জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ) গড়ে তুলুন। অর্থাৎ– আপনি তার সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হোন যে, তুমি যে ব্যবসার জন্য ঋণ চাচ্ছ, আমাকে তার অংশীদার বানিয়ে নাও। ব্যবসা যদি লাভজনক হয়, তা হলে আমাকে এত শতাংশ দিয়ো। আর যদি লোকসান হয়, তা হলেও মুনাফার হারে আমি সেই ক্ষতি বহন করব। কিন্তু এটা বৈধ নয় যে, আপনি তাকে বলবেন, এই ঋণের উপর আমি তোমার নিকট থেকে এত পার্সেন্ট মুনাফা নেব। কারবারে তোমার লাভ হলো, না লোকসান হলো, আমি তা দেখব না। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম ও সুদ।

প্রচলিত সুদি ব্যবস্থার অপকারিতা

বর্তমানে Interest (সুদ)-এর যে সিস্টেমটি চালু আছে, তার সারাংশ হলো, অনেক সময় ঋণগ্রহীতার লোকসান হয়ে যায়। তখন ঋণদাতা লাভে থাকে আর ঋণগ্রহীতা লোকসানে থাকে। অনেক সময় এমন হয় যে, ঋণগ্রহীতা বিপুলহারে মুনাফা অর্জন করল আর ঋণদাতাকে সে সামান্য লাভ দিল। এবার ঋণদাতা ক্ষতির মধ্যে থাকল। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝুন।

ডিপোজিটাররা সব সময়ই লোকসানের মধ্যে থাকে

যেমন– এক ব্যক্তি এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। এই এক কোটি টাকা তার কাছে কোথা থেকে এলো? এই টাকাগুলো কার? বলা বাহুল্য যে, এই টাকাগুলো সে ব্যাংক থেকে নিয়েছে। আর ব্যাংকের এই

টাকাগুলো ডিপোজিটারদের। বলা যায়, এই এক কোটি টাকা গোটা জাতির। এখন লোকটি জাতির এই এক কোটি টাকা দ্বারা ব্যবসা শুরু করল এবং এই ব্যবসায় সে একশো ভাগ মুনাফা অর্জন করল। এখন তার সম্পদ দাঁড়িয়েছে দুই কোটি টাকায়। এখান থেকে সে ১৫ পার্সেন্ট, তথা ১৫ লাখ টাকা ব্যাংককে দিয়ে দিল। ব্যাংক সেখান থেকে তার কমিশন ও যাবতীয় ব্যয় বের করে অবশিষ্ট ৭ কিংবা ১০ ভাগ ডিপোজিটারকে দিল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যাদের অর্থ এই ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছিল, যার মাধ্যমে এই মুনাফা অর্জিত হয়েছিল, তারা পেল শতকরা মাত্র ১০ টাকা। আর এই বেচারা ডিপোজিটার খুবই আনন্দিত যে, আমার একশো টাকা এখন একশো দশ টাকা হয়ে গেছে। অথচ তার এই তথ্য জানা নেই যে, তার টাকা দ্বারা যে অংকের মুনাফা অর্জন করা হয়েছে, তাতে তার একশো টাকা দুশো টাকায় পরিণত হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু তারপরও আরও যা হচ্ছে, তা হলো, ঋণগ্রহীতা ডিপোজিটারের মুনাফার এই ১০ টাকা পুনরায় তার থেকে উসুল করে নিয়ে নিচ্ছে।

কীভাবে নিচ্ছে?

সুদের অর্থ উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়

এভাবে নিচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা এই ১০ টাকাকে তার পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। যেমন– সে ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কারখানা খুলল কিংবা কোনো পণ্য উৎপাদন করল। তো এই উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সুদের সেই ১৫ পার্সেন্টকেও যোগ করে নিল, যা সে ব্যাংককে পরিশোধ করেছিল। ফলে তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ১৫ শতাংশ বেড়ে গেল। যেমন– সে কাপড় প্রস্তুত করেছিল। তো সুদের টাকা যুক্ত হওয়ার কারণে কাপড়টির উৎপাদনব্যয় ১৫ ভাগ বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় ডিপোজিটার ব্যাংকে একশো টাকা জিপোজিট রেখে যে একশো দশ টাকা পেয়েছিল, তিনি যখন বাজার থেকে কাপড়টি ক্রয় করবেন, তখন তাকে এই কাপড়টির মূল্য ১৫ শতাংশ বেশি পরিশোধ করতে হবে।

তা হলে ফলাফল এই বের হলো যে, ডিপোজিটার যে ১০ পার্সেন্ট মুনাফা করেছিল, ঋণগ্রহীতা তার চেয়েও বেশি, ১৫ পার্সেন্ট আদায় করে নিয়ে গেছে। অথচ জিপোজিটার খুবই আনন্দিত, আমি ১০০ টাকা ডিপোজিট করে ১১০ টাকা পেয়েছি! কিন্তু প্রকৃত হিসাবে সে ১০০ টাকার পরিবর্তে পেয়েছে ৯৫ টাকা। কারণ, সেই ১৫ শতাংশ চলে গেছে কাপড়ের উৎপাদনব্যয়ে আর ৮৫ শতাংশ মুনাফা ঢুকে গেছে ঋণগ্রহীতার পকেটে।

ব্যবসায় অংশিদারিত্বের উপকারিতা

এই ব্যবসায়িক চুক্তিটি যদি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে হতো, তা হলে বিনিয়োগকারীরা ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৫০ শতাংশ মুনাফা পেত এবং এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারীদের মুনাফার এই ৫০ শতাংশ পণ্যের উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হতো না।

কারণ, তখন উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হওয়ার পর মুনাফা সামনে আসত এবং তার পরে বণ্টিত হতো। যেমন– চুক্তিটি এভাবে হতে পারত যে, মুনাফার ৫০ ভাগ বিনিয়োগকারীর আর ৫০ ভাগ যিনি শ্রম দিয়ে ব্যবসা করবেন তার। এভাবে হলে বিনিয়োগকারীরা সুদি বিনিয়োগের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হতো না।

লাভ একজনের, লোকসান আরেকজনের!

আবার দেখুন, কেউ ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। কিন্তু সেই ব্যবসায় তার লোকসান হয়ে গেল। এই লোকসানের ফলে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে গেল। এখন ব্যাংকটির দেউলিয়াত্বের কারণে কার টাকা গেল? জানা কথা যে, যা গেল, জনগণের গেল। তো এই পদ্ধতির বিনিয়োগে লোকসান পুরোটাই পাবলিকের ঘাড়ে চাপে। পক্ষান্তরে যদি মুনাফা হয়, তা হলে পুরোটাই ঢোকে ঋণগ্রহীতার পকেটে।

বীমা কোম্পানী দ্বারা কে লাভবান হচ্ছে?

ঋণগ্রহীতার যদি লোকসান হয়ে যায়, তা হলে তার প্রতিকারের জন্য সে ভিন্ন একটি পথ খুঁজে নিয়েছে। তা হলো ইন্স্যুরেন্স। যেমন– ধরুন, তুলার গুদামে আগুন লাগল। এমতাবস্থায় এই ক্ষয়ক্ষতির প্রতিকারের দায়িত্ব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর উপর অর্পিত হয়।

প্রশ্ন হলো, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে টাকাগুলো কার? ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী কার অর্থ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ দেবে? এগুলো গরিব জনগণের টাকা। সেই জনগণের, যারা ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি রাস্তায় নামাতে পারে না, যতক্ষণ-না গাড়িটিকে ইন্স্যুরেন্স করিয়ে নেবে। আর গরিব জনগণের গাড়ি একসিডেন্ট করে না, তাতে আগুনও লাগে না। কিন্তু বীমার কিস্তি যথারীতি আদায় করতে তারা বাধ্য। এই গরিব জনসাধারণের বীমার কিস্তির টাকা দ্বারা কোম্পানীর নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাদের ডিপোজিটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীর ক্ষতিপূরণ করছে। এসব গোলকধাঁধা এজন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে, যাতে যদি মুনাফা হয়, তা যেন পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর বাটে থাকে। আর যদি লোকসান হয়, তা যেন গরিব জনসাধারণের ঘাড়ে চাপে।

ব্যাংকে গোটা জাতির যে অর্থ আছে, তাকে যদি সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হতো, তা হলে তার সমুদয় মুনাফা জনসাধারণের হাতে আসত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সম্পদ বণ্টনের যে পদ্ধতি চালু আছে, তার ফলে সম্পদ নিচের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে উপরের দিকে যাচ্ছে।

এসব অপকারিতার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সুদ খাওয়া এমন, যেন নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা। এটি এত মারাত্মক এইজন্য যে, এর মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়।

সুদের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা

আগে আমরা সুদকে শুধু এজন্য হারাম বলে বিশ্বাস করতাম যে, পবিত্র কুরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে। এর পক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ত না এবং এ নিয়ে তেমন আলোচনা-পর্যালোচনাও হতো না। আল্লাহ যখন হারাম সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, ব্যস, হারাম। কিন্তু বর্তমান কালের অবস্থা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে Interest (সুদি) ব্যবস্থা চালু আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের এই দেশটি (আমেরিকা) এখন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি। একটি প্রতিদ্বন্দ্বী যা-ও ছিল, তারও পতন ঘটেছে। এখন এর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কোনো শক্তি দুনিয়াতে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তারপরও দেশটি অর্থনৈতিক মন্দার শিকার। এর মূলেও Interest (সুদ)।

কাজেই আমি বাস্তবতার আলোকেও বলতে পারি, 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গরিব শ্রেণীর মানুষ সুদের উপর লোন নিত। তাদের থেকে সুদ নেওয়া হারাম ছিল। কিন্তু এ যুগের কমার্শিয়াল লোন সে যুগে ছিল না বিধায় একে হারাম বলা যাবে না।' যুক্তি ও অর্থনীতির বিচারে এই বক্তব্য সঠিক নয়। কেউ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক কালের এই সুদভিত্তিক অর্থনীতি অধ্যয়ন করে, তা হলে তার কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, এই অর্থব্যবস্থা পৃথিবীটাকে ধ্বংসের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহ চাহেন তো এমন একটি সময় আসবে, তখন মানুষের সম্মুখে এর বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, পবিত্র কুরআন সুদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ হলো সুদ হারাম হওয়ার একটি দিক, আমি যা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি।

সুদী ব্যবস্থার বিকল্প

আরও একটি প্রশ্ন আছে, যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা আজকাল মানুষের মনে জাগ্রত হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, আমরা একথা স্বীকার করি যে, 'ইন্টারেস্ট' হারাম। কিন্তু যদি 'ইন্টারেস্ট'কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, তা হলে এর বিকল্প পদ্ধতিটা কী হবে, যার মাধ্যমে অর্থনীতি পরিচালিত হবে? কারণ, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে অর্থনীতির প্রাণ 'ইন্টারেস্টে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রাণটিকে যদি বের করে দেওয়া হয়, তা হলে তো একে পরিচালনা করার মতো দ্বিতীয় কোনো পদ্ধতি চোখে পড়ছে না। এজন্য মানুষ বলছে, 'ইন্টারেস্ট' ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যবস্থার অস্তিত্বই নেই। থাকেও যদি, তা হলে তা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। তদুপরি কারও কাছে যদি বাস্তবায়নযোগ্য কোনো ব্যবস্থা থাকে, তা হলে তিনি সেটি উপস্থাপন করুন। তিনি বলুন সেটি কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। এক বৈঠকে আলোচনা করে বিষয়টি পুরোপুরি বোঝানো সম্ভব নয়। এর উত্তর খানিক টেকনিক্যালও। একে সহজবোধ্য ও সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করা সহজও নয়। তবে আমি বিষয়টিকে সহজবোধ্য উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি, যাতে আপনারা বুঝতে সক্ষম হন।

ইসলাম অপরিহার্য বিষয়াবলিকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেনি

সবার আগে একথাটি বুঝে নিন যে, আল্লাহ পাক যখন কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তখন সেটি হারামই। এমতাবস্থায় এটা সম্ভবই নয় যে, সেই বস্তুটি মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে এবং মানুষ সেই বস্তুটি ব্যতীত চলতে পারবে না। কারণ, সেই বস্তুটি যদি অপররিহার্য হতো, তা হলে আল্লাহ তাকে হারাম সাব্যস্ত করতেনই না। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কোনো মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য চাপান না।'

(সূরা বাকারা : ২৮৬)

অর্থাৎ– আল্লাহ মানুষকে এমন কোনো আদেশ করেন না, যেটি পালন করা তার সাধ্যের অতীত। কাজেই একজন মুমিনের জন্য এতটুকু কথা-ই যথেষ্ট যে, একটি বিষয়কে আল্লাহপাক যখন হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তা হলে আল্লাহ্ পাকের এই হারাম করা-ই প্রমাণ করে, এটি মানুষের জন্য অপরিহার্য নয়। এটি ছাড়াও মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব। এর মাঝে কোনো অসুবিধা

অবশ্যই আছে। একথা বলা যাবে না যে, এটি ছাড়া কাজ চলবে না এবং এটি অপরিহার্য বিষয়।

'সুদী ঋণে'র বিকল্প শুধু 'করজে হাসানা'-ই নয়

দ্বিতীয় কথাটি হলো, কিছু লোক মনে করে, 'ইন্টারেস্ট' (সুদ) – যাকে পবিত্র কুরআন হারাম সাব্যস্ত করেছে – তার অর্থ হলো, আগামীতে যখন কাউকে ঋণ প্রদান করা হবে, তখন তাকে সুদবিহীন ঋণ দেবে এবং তার জন্য কোনো মুনাফা দাবি করবে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যখন 'ইন্টারেস্ট' (সুদ) বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন আমরা সুদবিহীন ঋণ পাব আর সেই ঋণের টাকা দ্বারা আমরা বাড়ি নির্মাণ করব, মিল-কারখানা স্থাপন করব এবং আমাদের নিকট থেকে কেউ 'ইন্টারেস্ট' দাবি করবে না। আর এই চিন্তার উপরই ভিত্তি করে মানুষ বলছে, এই পন্থাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই ঋণ কেউ দেবে না।

সুদী ঋণের বিকল্প 'অংশীদারিত্ব'

মনে রাখবেন, Interest-এর বিকল্প (Alternative) 'করজে হাসানা' নয় যে, আপনি কাউকে এমনিতেই ঋণ দিয়ে দেবেন। বরং তার বিকল্প হলো, 'অংশীদারিত্ব'। অর্থাৎ– কেউ যদি ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণ করে, তা হলে ঋণদাতা একথা বলতে পারে, আমি তোমার ব্যবসায় অংশীদার হতে চাই। ব্যবসায় যদি তোমার লাভ হয়, তা হলে তার একটি অংশ আমাকে দিতে হবে। আর যদি লোকসান হয়, তা হলে আমি তাতেও তোমার অংশীদার হব। এভাবে ঋণদাতা এই ব্যবসার লাভ-লোকসানে অংশীদার হয়ে যাবে এবং ব্যবসাটি অংশীদারত্বের ব্যবসায় পরিণত হবে। এই হলো Interest-এর বিকল্প পদ্ধতি (Alternative System)

এই অংশীদারিত্বের তাত্ত্বিক দিকটি আমি আপনাদের সম্মুখে আগেও উপস্থাপন করেছি যে, Interest পদ্ধতিতে সম্পদের অতি সামান্য অংশ ডিপোজিটারদের হাতে যায়। কিন্তু যদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করা হয় এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজিবিনিয়োগ (Financing) করা হয়, তা হলে এই পদ্ধতিতে ব্যবসায় যা মুনাফা হবে, তার একটি যৌক্তিক অংশ বিনিয়োগকারীদের হাতে যাবে। আর এই পদ্ধতিতে সম্পদের বণ্টন (Distribution Of Wealth) উপরের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে নিচের দিকে আসবে। কাজেই ইসলাম যে বিকল্প ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে, সেটি হলো, 'অংশিদারিত্বের ব্যবস্থা'।

অংশীদারিত্বের শুভ ফলাফল

কিন্তু এই অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা যেহেতু বর্তমান পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কোথাও চালু হয়নি এবং তার অনুসরণ শুরু হয়নি, তাই তার বরকতও মানুষের সম্মুখে আসছে না। সাম্প্রতিককালে এই ২০-২৫ বছর হলো, মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পদ্ধতিটি চালু করার চেষ্টা চালানো হয়েছে যে, এমন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করা হবে, যেটি 'ইন্টারেস্ট' (সুদী) পদ্ধতির পরিবর্তে ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আপনাদের জানা থাকার কথা যে, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অন্ততপক্ষে ৮০ থেকে ১০০টি ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলোর দাবি হলো, আমরা ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসারে কারবার পরিচালনা করছি এবং সুদমুক্ত ব্যবসা করছি।

আমি একথা বলছি না যে, তাদের এই দাবি শতভাগ সঠিক। বরং হতে পারে, তাতে কিছু ভুল-ত্রুটিও আছে। কিন্তু একথাটি সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক সুদবিহীন ব্যবস্থার উপর কাজ করছে। উক্ত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারি পদ্ধতির বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে। আর যেখানেই অংশীদারি পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই তার ভালো সুফল পাওয়া গেছে। আমরা পাকিস্তানে একটি ব্যাংকে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা করেছি। আমি নিজে উক্ত ব্যাংকের 'মাযহাবী নেগরান কমিটি'র (ধর্মীয় তত্ত্বাবধান পরিষদ) একজন সদস্য হওয়ার সুবাদে ব্যাংকটির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত আছি। এই ব্যাংক 'অংশীদারিত্ব' নীতির ভিত্তিতে ডিপোজিটারদের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা প্রদান করেছে। কাজেই যদি এই 'অংশীদারিত্ব' পদ্ধতিটিকে ব্যাপকভাবে চালু করা যায়, তা হলে এর ফলাফল আরও ভালো হতে পারে।

অংশীদারিত্বের বাস্তবায়নগত জটিলতা

কিন্তু এই পদ্ধতির বাস্তবায়নগত একটি জটিলতাও আছে। তা হলো, যেমন– এক ব্যক্তি অংশিদারির ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে অর্থ নিল। আর অংশীদারি মানে লাভে ও লোকসানে অংশগ্রহণ। অর্থাৎ– যদি ব্যবসায় লাভ হয়, তাতেও অংশীদার হবে এবং যদি লোকসান হয়, তাতেও অংশীদার হবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, খোদ আমাদের মুসলিম বিশ্বে অসততা ও অবিশ্বস্ততা এত বেশি ও এত ব্যাপক যে, কোনো ব্যক্তি যদি এই ভিত্তির উপর ব্যাংক থেকে অর্থ নিতে পারে যে, লাভ হলে লাভ এনে দেব আর লোকসান হলে ব্যাংকও তার অংশীদার হবে, তা হলে বিনিয়োগ গ্রহীতা

বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যাংক থেকে বিদায় নেওয়ার পর আর ফিরে আসবে না। সে ব্যাংককে শুধু লোকসানই দেখাবে এবং মুনাফা দেওয়ার পরিবর্তে উল্টো ব্যাংকের কাছে লোকসানের ভর্তুকি দাবি করবে।

অংশীদারিত্ব পদ্ধতির বাস্তবায়নগত দিকের এটি একটি গুরুতর সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার সম্পর্ক অংশীদারিত্ব সিস্টেমের সঙ্গে নয়। বরং এর সম্পর্ক সেই মানুষের ত্রুটির সঙ্গে, যারা এই ব্যবস্থার অনুসরণ করছে। তাদের মাঝে উত্তম চরিত্র, সততা ও আমানত নেই। আর এ-কারণেই 'অংশীদারিত্ব' পদ্ধতির মাঝে এই ঝুঁকি বিরাজমান যে, মানুষ ব্যাংক থেকে 'অংশীদারিত্বে'র চুক্তিতে ঋণ নেবে আর পরে ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে ডিপোজিটারদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এই জটিলতার সমাধান

কিন্তু এটি সমাধান-অযোগ্য কোনো সমস্যা নয়। এটি এমন কোনো সমস্যা নয় যে, এর কোনো সমাধান খুঁজে বের করা যাবে না। কোনো রাষ্ট্র যদি 'অংশীদারিত্ব' ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেয়, তা হলে সেই দেশ অনায়াসেই এই সমস্যার সমাধান বের করে নিতে সক্ষম হবে। যার সম্পর্কে প্রমাণিত হবে, বিনিয়োগের জন্য অর্থ গ্রহণের পর সে অসততার পরিচয় দিয়েছে এবং তার একাউন্টস্ প্রদর্শনে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তা হলে সরকার তাকে দীর্ঘ একটি সময়ের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করে দেবে এবং ভবিষ্যতে কোনো ব্যাংক তাকে ফাইন্যান্সিং-এর কোনো সুবিধা প্রদান করবে না। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানুষ অসততা প্রদর্শন ও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে ভয় পাবে। বর্তমানেও বিভিন্ন 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' কাজ করছে এবং তারা তাদের ব্যালেন্সসীট প্রকাশ করছে। সেই সীটে দুর্নীতিও হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাতে মুনাফা দেখাচ্ছে।

কাজেই 'অংশীদারিত্ব' ব্যবস্থাকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, তা হলে এই সমাধানটিকেও অবলম্বন করা যেতে পারে।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে এই ব্যবস্থার বাস্তবায়ন খুবই কঠিন কাজ। তবে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিলেক্টেড (যাচাই করা কিছু) ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বচ্ছ কথাবার্তার মাধ্যমে 'অংশীদারিত্ব' করতে পারে।

দ্বিতীয় বিকল্প পদ্ধতি 'ইজারা'

তা ছাড়া আল্লাহপাক ইসলামের আদলে আমাদেরকে এমন একটি দ্বীন দান করেছেন, যার মধ্যে 'মুশারাকা' ছাড়াও ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং-এর

আরও বহু পদ্ধতি আছে। যেমন– একটি পদ্ধতি আছে 'ইজারা' (Leasing)| পদ্ধতিটি হলো, এক ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকে আবেদন জানাল। ব্যাংক তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কোন কাজে টাকা দরকার? তিনি বললেন, কারখানার জন্য আমার বিদেশ থেকে একটি মেশিন আমদানি করতে হবে। ব্যাংক তাকে টাকা দিল না। বরং নিজেরা মেশিন কিনে ভাড়ার চুক্তিতে তাকে দিয়ে দিল। পরিভাষায় এই কাজটিকে 'ইজারা' বা Leasing বলা হয়। কিন্তু আজকাল ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোতে 'ফাইন্যান্সিং লিজিং'-এর যে-পদ্ধতিটি চালু আছে, তা শরীয়তসম্মত নয়। এর এগ্রিমেন্টে অনেকগুলো ধারা (Clauses) শরীয়ত পরিপন্থী। তবে একে খুব সহজেই শরীয়তসম্মত বানিয়ে নেওয়া যায়। পাকিস্তানে একাধিক ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যেগুলোর লিজিং এগ্রিমেন্ট শরীয়তসম্মত।

তৃতীয় বিকল্প পদ্ধতি 'মুরাবাহা'

অনুরূপ আরও একটি পদ্ধতি আছে, আপনারা যার নাম শুনে থাকবেন। সেটি হলো, 'মুরাবাহা ফাইন্যান্সিং'। এটিও অপরের সঙ্গে লেনদেন করার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লাভের ভিত্তিতে পণ্যটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণের আবেদন জানাল। কিন্তু ব্যাংক তাকে টাকা না দিয়ে সেই মালটি ক্রয় করে লাভের ভিত্তিতে তার কাছে বিক্রি করল। ইসলামে এই পদ্ধতিও জায়েয। অনেকে মনে করে, এই পদ্ধতি তো হাত ঘুরিয়ে কান ধরার মতো হয়ে গেল। কারণ, এখানে ব্যাংক এক পদ্ধতির পরিবর্তে আরেক পদ্ধতিতে মুনাফা আদায় করে নিল। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর রিবাকে করেছেন হারাম।'

(সূরা বাকারা, ২৭৫)

ক্রয়-বিক্রয় হালাল আর রিবা (সুদ) হারাম এটি আল্লাহপাকের সিদ্ধান্ত। কাজেই এখানে মানুষের প্রশ্ন তুলবার কোনোই সুযোগ নেই। তা ছাড়া মক্কার মুশরিকরাও এই যুক্তির অবতারণা করত। তারা বলত, ক্রয়-বিক্রয় তো রিবারই মতো। ক্রয়-বিক্রয়েও মানুষ মুনাফা অর্জন করে, রিবায়ও মুনাফা অর্জন করে। কাজেই দুয়ের মাঝে পার্থক্যটা কী? পবিত্র কুরআন তাদেরকে একটিই উত্তর দিয়েছিল যে, এটি আমার বিধান যে, রিবা হারাম আর ক্রয়-

বিক্রয় হালাল। এর অর্থ হলো, অর্থের উপর অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া যায় না এবং অর্থের উপর অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া যায় না। কিন্তু মধ্যখানে যদি কোনো বস্তু কিংবা ব্যবসাপণ্য এসে পড়ে এবং সেই পণ্য বিক্রি করে মুনাফা করে, তা হলে আমি তাকে হালাল ঘোষণা করলাম। আর মুরাবাহা পদ্ধতিতে মধ্যখানে পণ্য আসছে। এজন্য ইসলামের আইনে এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

পছন্দনীয় বিকল্প কোনটি?

কিন্তু এই 'মুরাবাহা' ও 'লিজিং' কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয় বিকল্প নয় এবং এর দ্বারা সম্পদ বণ্টনের উপর মৌলিক কোনো প্রভাব পড়ে না। পছন্দনীয় বিকল্প হলো 'মুশারাকা'। কিন্তু আগামীতে যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে, তাদের জন্য পরীক্ষামূলক মেয়াদে মুরাবাহা ও লিজিং পদ্ধতির উপর কাজ করার সুযোগ আছে। বর্তমানেও কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এসব ভিত্তির উপর কাজ করছে।

এ হলো, সুদ ও এতদ্‌সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণ কথা, যা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। সুদসম্পর্কিত আরও একটি মাসআলা আছে. যার প্রতিধ্বনি বারবার কানে আসছে। তা হলো, অনেকে বলছে, দারুল হার্‌বে –যেখানে অমুসলিমদের শাসন চলছে– সুদি লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই। সেসব দেশে অমুসলিম সরকার থেকে সুদ নেওয়া যায়। এ মাসআলাটির উপর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, চাই দারুল হার্‌ব হোক, চাই দারুল ইসলাম, সুদ সবখানেই হারাম। সুদ দারুল ইসলামে যেমন হারাম, তেমনি দারুল হার্‌বেও হারাম।

তবে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানগণ যেন অবশ্যই ব্যাংকে কারেন্ট একাউন্ট ব্যবহার করে, যেখানে আমানতের উপর কোনো সুদ আসে না। যদি কেউ ভুলবশত সেভিংস একাউন্ট ব্যবহার করে ফেলে, তা হলে তাতে যে সুদ আসে, পাকিস্তানে তো আমরা মানুষদের বলে দেই যে, সুদের অর্থ ব্যাংকেই রেখে দিন। কিন্তু যেসব দেশে এমন অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় হয়, সেসব দেশে মুসলমানদের উচিত, সুদের অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে ছাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে সাদাকা করে দেওয়া এবং সেই অর্থ নিজের কাজে না লাগানো।

আধুনিক যুগে ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠান

আমি আরও একটি কাজের কথা বলতে চাই। কাজটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা কঠিন মনে হচ্ছে। কিন্তু তথাপি সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা করা দরকার।

কাজটি হলো, আমরা নিজেরা এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাব, যেটি ইসলামী ভিত্তির উপর কাজ করবে। আর যেমনটি আমি এইমাত্র বলেছি যে, 'মুশারাকা', 'মুরাবাহা' ও 'লিজিং' পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে এবং সেসব ভিত্তির উপর মুসলমানগণ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারে। এখানকার মুসলমানগণ মাশাআল্লাহ এই বিষয়টি বোঝে এবং এর মাঝে স্বয়ং তাদের জন্য সমস্যাবলির সমাধানও আছে। তাদের উচিত, এখানে বসে 'ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত করা। আমেরিকায় আমার জানামতে কমপক্ষে হাউজিং-এর সীমা পর্যন্ত দুটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে এবং তারা সঠিক ইসলামী ভিত্তির উপর কাজ করছে। তার একটি টরেন্টোতে, অপরটি লস্এন্জেল্স-এ। এখন এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো দরকার এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের মতো করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো আবশ্যক। কিন্তু তার জন্য বুনিয়াদি শর্ত হলো, কাজটি করতে হবে বিজ্ঞ ফকীহ ও মুফতীদের পরামর্শ অনুপাতে। আপনারা যদি এ কাজে আমার থেকেও সহযোগিতা নিতে চান, আমি আপনাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছি। যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এবং প্রায় পাঁচ বছর যাবত আমি সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেদমতে নিয়োজিত আছি। মহান আল্লাহ আপনাদেরকেও এই কাজের তাওফীক দান করুন এবং মুসলমানদের জন্য ভালো একটি পথ বের করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত– খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৭-৭০

প্রচলিত সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদী মহাজন, সুদের খাতক, সুদী লেনদেনের স্বাক্ষী ও সুদের চুক্তিলিপিবদ্ধকারীর উপর অভিশম্পাত করেছেন।'

-তিরমিযী হাদীস নং ১১২৭, আবু দাউদ হাদীস নং ২৮৯৫,
ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২৬৮

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সুদের কারবার যেমন হারাম, তেমনি সুদের দালালি করা কিংবা সুদের হিসাব লেখাও না-জায়েয। এই হাদীসেরই ভিত্তিতে ফাতাওয়া প্রদান করা হচ্ছে, আজকালকার ব্যাংকগুলোতে চাকুরি করা জায়েয নয়। কেননা, এই প্রক্রিয়ায় মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে সুদী কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের চুক্তি লিপিবদ্ধকারী

এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাফেয ইবনে হাজ্‌র আসকালানী রহ. লিখেছেন, হাদীসে উল্লিখিত 'কাতিবে রিবা' দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তি, যে সুদী লেনদেনের চুক্তির সময় সুদ ইত্যাদির হিসাব লিখে উভয় পক্ষের এই চুক্তিতে সহযোগিতা করে। এমন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি সুদী লেনদেনের চুক্তির সময় এসব হিসাব লিখে না; তবে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে বিগত সময়ের সমস্ত হিসাবের অডিট করে, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করে, এমন ব্যক্তি এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, সে সুদী কারবারের চুক্তিতে সহযোগিতা করেনি। এই বিশ্লেষণ অনুপাতে একাউন্টস ও অডিটের কাজে যারা নিয়োজিত, যাদেরকে বিভিন্ন ফার্ম, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর পুরো বছরের

হিসাব লিপিবদ্ধ করতে হয়, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, আবার প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃত সুদ ইত্যাদির হিসাবও লিখতে হয়। কিন্তু তাদের এই লেখা একটি বাৎসরিক রিপোর্টের মর্যাদা রাখে – কোম্পানীর সুদী লেনদেনে কোনো সহযোগিতা করে না। এমন ব্যক্তিবর্গ আলোচ্য হুমকির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

ব্যাংকে চাকুরি করা হারাম কেন?

প্রশ্ন আসে, ব্যাংকে চাকুরি করা হারাম কেন? যুক্তি দেখানো হয়, আজকাল তো সব জায়গা থেকে অর্থ ব্যাংকেরই মাধ্যমে আসে। কোনো বস্তুই সুদ থেকে মুক্ত নয়। এমতাবস্থায় আমাদের চাকুরিটা হারাম হবে কেন?

এর উত্তর হলো, শরীয়ত প্রতিটি জিনিসের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এই সীমা পর্যন্ত জায়েয এবং এর বাইরে গেলে না-জায়েয। ব্যাংকের চাকুরি না-জায়েয হওয়ার কারণ হলো, ব্যাংকের মাধ্যমে সুদী লেনদেন হয়। আর যারা সুদী ব্যাংকে চাকুরি করেন, তারা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে সুদী লেনদেনে সহযোগিতা করছেন। আর যে কোনো গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে হারাম। আল্লাহপাক বলেন :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'তোমরা অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহায়তা করো না।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ২)

এ কারণে ব্যাংকের চাকুরি হারাম।

আর এই যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, সকল অর্থ ব্যাংকেরই মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে, তাই ব্যাংকের চাকুরি হারাম হলে সকল পেশা-ই হারাম হওয়া দরকার। শুধু ব্যাংকের চাকুরি হারাম হবে কেন?

এর উত্তর হলো, ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষের হাতে যেসব অর্থ আসছে, সেই অর্থ যদি হালাল উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে, তা হলে এই অর্থ ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি হারাম উপায়ে অর্জিত হয়, তা হলে এই অর্থের ব্যবহারও হারাম হবে।

কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত 'রিবা'

'রিবা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বাড়তি বা অতিরিক্ত। শরীয়তের পরিভাষায় এই শব্দটি পাঁচ ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যবহার দুটি অর্থে হয়ে থাকে।

এক. 'রিবান নাসীআহ'

দুই. রিবাল ফায্‌ল' ।

'রিবান নাসীআহ'-এর সংজ্ঞা হলো :

هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ.

'সেই ঋণ, যেখানে ঋণগ্রহীতার জন্য নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত পরিশোধের শর্ত থাকে ।' এর আরেক নাম 'রিবাল কুরআন'

'রিবাল ফায্‌ল'-এর সংজ্ঞা হলো

'এক জাতীয় দুটি বস্তুর মাঝে বিনিময়ের সময় কম-বেশি করা । এর আরেক নাম 'রিবাল হাদীস' ।

প্রথমটিকে হারাম করেছে কুরআন; তাই এর নাম 'রিবাল কুরআন' ।। আর দ্বিতীয়টিকে হারাম করেছে হাদীস; তাই এর নাম 'রিবাল হাদীস' ।

'সরল সুদ' ও 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' উভয়ই হারাম

অনেকে প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআন তো শুধু 'চক্রবৃদ্ধি সুদ'কে হারাম করেছে । কুরআন 'সরল সুদ'কে হারাম করেনি । তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা দলিল দিয়ে থাকে । আল্লাহপাক বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না ।'

(সূরা আলে ইমরান, ১৩০)

এই আয়াতে 'রিবা'র সঙ্গে 'চক্রবৃদ্ধি'র শর্ত যুক্ত করা হয়েছে । কাজেই কেবল সেই সুদ হারাম হবে, যাতে সুদের হার মূল অর্থের অন্তত দ্বিগুণ হবে ।

কিন্তু তাদের এই দলিল প্রদান সঠিক নয় । কারণ, সব যুগের সকল আলেম একমত যে, এই আয়াতে 'চক্রবৃদ্ধি'র শর্ত আরোপ করে একথা বোঝানো হয়নি যে, সকল ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়ার জন্য চক্রবৃদ্ধি শর্ত । চক্রবৃদ্ধি হলেই কেবল সুদ হারাম হবে; অন্যথায় হারাম হবে না । বরং এখানে বলা হয়েছে, চক্রবৃদ্ধিহারে যে সুদ নেওয়া হয়, সেটি হারাম । আর আল্লাহপাক এই নিষেধাজ্ঞা একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারি করেছেন, যেখানে চক্রবৃদ্ধির বিষয়টি ছিল ।

এই শর্তারোপের বিষয়টি এমন, যেমন– এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

'তোমরা আমার (আল্লাহর) আয়াতসমূহ অল্প দামে বিক্রি করো না।'

(সূরা বাকারা, ৪১)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক কুরআনকে অল্প দামে বিক্রি করতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ– বিক্রয়ের সঙ্গে 'অল্প দাম'-এর শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু কোনো বিবেকবান মানুষই আয়াতটির এই মর্ম বুঝবে না যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করা হারাম বলা হয়েছে বটে; কিন্তু বেশি দামে বিক্রি করতে কোনো দোষ নেই। কাজেই এই আয়াতের শর্ত আর উল্লিখিত আয়াতের শর্ত একই পর্যায়ভুক্ত।

এ জাতীয় আরও কয়েকটি আয়াত দেখুন।

আল্লাহপাক বলছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।' (সূরা বাকারা, ২৭৮)

এই আয়াতে مَا শব্দটি ব্যাপক, যা রিবার প্রত্যেক অল্প ও অধিক পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন :

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

'আজ জাহেলিয়াতের সুদ পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের সুদ, মানে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব-এর সুদকে রহিত ঘোষণা করছি। তার সুদ পুরোপুরি পরিত্যাজ্য।'

(মুসলিম : ১২৩৭, আবু দাউদ : ১৬২৮, ইবনে মাজাহ : ৩০৪৬)

এই হাদীসে كُلُّ (সমস্ত) শব্দটি রিবার যে কোনো পরিমাণকে সুস্পষ্টরূপে হারাম সাব্যস্ত করছে।

হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

'যে ঋণ মুনাফা টানে, সেটিই রিবা।'

(কাশফুল খাফা : ২য়, ১২৫, হাদীস নং ১৯১৯, আলকাবায়ের ১ম, ৬১)

এই হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর نَفْعًا শব্দটি একথা প্রমাণ করে যে, মুনাফার যে কোনো পরিমাণ হারাম।

এই বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গেল, আয়াতে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (চক্রবৃদ্ধিহারে)-এর এই শর্তটি প্রাসঙ্গিক–মৌলিক নয়।

সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহপাকের যুদ্ধ ঘোষণা

সুদ হারাম হওয়ার আয়াতগুলো অকাট্য এবং যারা সুদ খায়, সুদের কারবার করে, পবিত্র কুরআনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ঘোষণা করা হয়েছে। এত শক্ত হুঁশিয়ারি যে, সম্ভবত এমন কঠোর হুঁশিয়ারি অন্য কোনো অপরাধের বেলায় ঘোষণা করা হয়নি। যেমন– এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٧٨) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা তা না কর (সুদের বকেয়া না ছাড় এবং সুদের কারবার অব্যাহত রাখ), তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।'

(সূরা বাকরা, ২৭৮-২৭৯)

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি সুদের লেনদেন, সুদের কারবার পরিত্যাগ না কর, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।

বর্তমান ব্যাংকগুলোর সুদ হারাম নয় কি?

আজ গোটা বিশ্ব সুদের জালে আটকে আছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি-ই তো সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। সকল ব্যবসা সুদের ভিত্তিতে চলছে। বড়-বড় পুঁজিপতিরা, বড়-বড় কোম্পানীগুলো ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নিচ্ছে এবং সেই অর্থ দ্বারা কারবার পরিচালনা করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্বে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যে, তারা দাবি করে বসেছেন, বর্তমান ব্যাংকগুলোর সুদ সেই সুদ নয়, যাকে পবিত্র কুরআন হারাম করেছে। তারা প্রমাণ উপস্থাপন করছে, সে যুগে মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ নিত। যেমন– একজন মানুষের ঘরে খাওয়ার কিছু নেই এবং তার কাছে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার মতো কোনো অর্থ নেই। এমতাবস্থায় সে কোনো একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল, আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে আছি; আমাকে কিছু টাকা ঋণ দিন, যাতে তা দ্বারা কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারি। উত্তরে লোকটি বলল, আমি তোমাকে ঋণ দিতে পারি; কিন্তু তাতে আমাকে সুদ দিতে হবে। আমি তোমাকে সুদের উপর ঋণ দিতে পারি। কাজেই তুমি ওয়াদা করো, এই ঋণের সঙ্গে এত টাকা সুদ পরিশোধ করবে।

তো বলা বাহুল্য, এটি চরম এক অবিচার যে, একজন মানুষ না খেয়ে জীবন যাপন করছে আর সেই ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনার কাছে ঋণ চাচ্ছে; কিন্তু আপনি তার কাছে সুদ দাবি করছেন! অথচ আপনার নৈতিক কর্তব্য ছিল, নিজের পক্ষ থেকে তার ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু সেই জায়গায় ঋণ দিয়ে আপনি তার থেকে সুদ দাবি করছেন। এমন সুদ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআন বলেছে, তোমরা যদি এই সুদ পরিত্যাগ না কর, তা হলে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কিংবা যেমন– এক ব্যক্তির ঘরে কেউ মারা গেল। তার কাফন-দাফনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা নেই। ফলে বাধ্য হয়ে সে আপনার কাছে কিছু টাকা ঋণ চাইল। কিন্তু আপনি বললেন, আমি তোমাকে ঋণ দেব; কিন্তু আমাকে এর জন্য সুদ দিতে হবে। আমি সুদ ছাড়া ঋণ দেব না। তো বলা বাহুল্য যে, এমন ক্ষেত্রেও সুদ দাবি করা মানবতার পরিপন্থী। তাই এ জাতীয় সুদকে পবিত্র কুরআন হারাম সাব্যস্ত করেছে।

বাণিজ্যিক ঋণের উপর সুদের স্বরূপ

কিন্তু বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলো থেকে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিরা এমন কোনো গরিব-অসহায় মানুষ নয়, যাদের পেটে খাবার নেই, গায়ে কাপড় নেই, লাশ দাফনের ব্যবস্থা নেই। ব্যাংক এমন নিঃস্ব লোকদেরকে ঋণ দেয়ই না। আপনি-আমি যদি ব্যাংকে লোনের জন্য যাই, তা হলে ব্যাংকওয়ালারা আমাদেরকে পিটিয়ে ব্যাংক থেকে বেরই করে দেবে। বরং ব্যাংক থেকে যারা লোন নেয়, তারা বড়-বড় পুঁজিপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। আর তারা পেটের দায়ে লোন নেয় না। বরং তাদের লোন নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, এই অর্থকে

ব্যবসায় বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা, মুনাফা করা। যেমন– ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে একে দুলাখ টাকায় পরিণত করা।

তা ছাড়া তারা ব্যাংক থেকে যে অর্থ লোন নেয়, সেগুলো জনগণেরই অর্থ। যারা তাদের উপার্জন থেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে ব্যাংকে আমানত রেখেছে। এমতাবস্থায় এই অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক যদি সুদের নামে কিছু মুনাফা গ্রহণ করে, তা হলে এতে দোষের কী আছে! এখানে অবিচারের কী আছে! কাজেই সে যুগে যে সুদের প্রচলন ছিল, তাতে ঋণগ্রহীতার উপর অবিচার হতো। আর সেজন্যই পবিত্র কুরআন সেই সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই বর্তমান যুগের ব্যাংকের সুদ হারাম নয়।

কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এক ধরনের ঋণ আছে, যাকে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য গ্রহণ করে থাকে। এমন ঋণকে 'সার্‌ফী ঋণ' বলা হয়। আরেক ধরনের ঋণ আছে, যাকে মানুষ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে থাকে। এমন ঋণকে 'বাণিজ্যিক ঋণ' বা 'উৎপাদনি ঋণ' বলা হয়। সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের দাবি হলো, পবিত্র কুরআন 'সার্‌ফি ঋণ'-এর উপর সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। 'বাণিজ্যিক ঋণের সুদ' হারাম নয়।

সুদ জায়েয হওয়ার ভ্রান্ত দলিল

যারা সুদকে জায়েয ও বৈধ লেনদেন বলে দাবি করছে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা দলিল উপস্থাপন করে থাকে। আল্লাহপাক বলেছেন :

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।'

(সূরা বাকারা, ২৭৫ আয়াত)

এই আয়াতটি উপস্থাপন করে তারা বলছে, এখানে সুদ বোঝাতে আল্লাহপাক الرِّبٰوا ('আর-রিবা') শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শুরুতে আলিফ লাম যুক্ত করে শব্দটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

কাজেই এখানে 'রিবা' বলতে সেই রিবাকে বোঝানো হয়েছে, জাহেলি যুগে ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুরু যুগে যার প্রচলন ছিল। আর সে যুগে সুদ বলতে শুধু 'সার্‌ফি ঋণের সুদে'রই প্রচলন ছিল। 'বাণিজ্যিক ঋণের সুদ'-এর প্রচলন সে যুগে ছিল না। কাজেই একথাটি বলে বোঝানোর আবশ্যকতা নেই যে, একটি যুগে যার প্রচলন থাকে না,

তাকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করার কোনো মানে হয় না। কাজেই পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে, সেটি সেই সুদ, যার প্রচলন সে যুগে ছিল। আর তা হলো, একান্ত ব্যক্তি পর্যায়ের ঋণের সুদ। অর্থাৎ– 'সার্‌ফি ঋণে'র উপর সুদ। 'বাণিজ্যিক ঋণে'র উপর সুদ হারাম হবে না।

এরা কারা?

যারা সুদের বৈধতার পক্ষে এই দলিল ও যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন, তারা সাধারণ কোনো মানুষ নন। তারা পড়া-লেখা করা ভালো-ভালো মানুষ। এমনকি মিসরের বর্তমান গ্রান্ড মুফতী পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর সুদকে হালাল বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। তার সেই ফতোয়ায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক রকম হইচই পড়ে গেছে এবং বিষয়টি আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই এই মতের পক্ষে কিছু-না-কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খান এবং আরবে মুফতী আব্‌দুহু ও রশীদ রেজাও এই মতের ধারক ছিলেন। পাকিস্তানে ডক্টর ফযলুর রহমান সাহেবও এই মতের সমর্থক ছিলেন। জাস্টিস কাদীরুদ্দীন খান এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে একখানা পুস্তিকাও রচনা করে ফেলেছিলেন। একজন মানুষ যদি গভীরভাবে না দেখে, তা হলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের দলিল ও যুক্তি-তর্ক হৃদয়ে এই আবেদন জাগায় যে, একজন পুঁজিপতি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মুনাফা অর্জন করছে। এমতাবস্থায় যদি তার থেকে সুদ দাবি করা হয়, তা হলে তাতে অবিচারের কী থাকতে পারে? এখানে অন্যায়ের তো কিছু নেই। ফলে সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী এই মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর সমর্থক হয়ে যাচ্ছে।

বিধান প্রকৃতির উপর আরোপিত হয় – আকৃতির উপর নয়

বাস্তবতা হলো, সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের উক্ত দলিল প্রদান মারাত্মক ভুল বুঝ ও বিভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দলিল উপস্থাপনের ভূমিকা ও ফলাফল দু-ই ভুল। তাদের দলিলের ভূমিকা হলো, নবীযুগে বাণিজ্যিক সুদের প্রচলন ছিল না। আর ফলাফল হলো, নবী যুগে যে কাজের প্রচলন থাকবে না, তার উপর হারামের সিদ্ধান্ত আরোপিত হবে না। তাদের এই ভূমিকা ও ফলাফল দুটোই ভুল। কাজেই তাদের এই দলিল সঠিক নয়।

আগে বুঝুন, এই ভূমিকা ভুল কেন। দেখুন, মূলনীতি হলো, পবিত্র কুরআন ও হাদীস যখন কোনো বিষয়ের উপর হালাল কিংবা হারামের বিধান আরোপিত করে, তখন বিধানটি সেই বস্তুর বিশেষ কোনো আকার বা

আকৃতির উপর আরোপ করে না। বরং তার প্রকৃতির উপর আরোপ করে। কাজেই যেখানে উক্ত প্রকৃতি পাওয়া যাবে, সেখানেই এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে।

যেমন– মদের বিষয়টি ধরুন। যে যুগে মদ হারাম হয়েছে, সে যুগে তখনকার মানুষ ঘরে বসে হাত দ্বারা নিংড়ে আঙুরের রস বের করে তাকে পঁচিয়ে মদ তৈরি করত। কাজেই এ যুগের কোনো ব্যক্তি যদি বলে, যেহেতু সে যুগে মানুষ হাতে মদ তৈরি করত এবং তাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো নীতিমালার অনুসরণ করা হতো না, সেজন্য সে যুগে মদকে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে যেহেতু উন্নতমানের মেশিনের সাহায্যে স্বাস্থ্যের সমস্ত নিয়ম-নীতির অনুসরণ করে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মদ তৈরি করা হয়, তাই আমাদের এ যুগের মদের উপর হারামের সিদ্ধান্ত আরোপিত হবে না।

তো বলা অনাবশ্যক যে, এই দলিল উপস্থাপন নিতান্তই বোকামিসুলভ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, শরীয়ত মদের বিশেষ কোনো আকার বা আকৃতিকে হারাম করেনি। বরং শরীয়ত হারাম করেছে মদের প্রকৃতিকে। কাজেই যে প্রকৃতির কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে, কোনো বস্তুর মধ্যে যদি সেই প্রকৃতিটি পাওয়া যায়, তা হলেই তার উপর হারামের বিধান আরোপিত হবে। চাই তার সেই বিশেষ আকৃতিটি রাসূলের যুগে থাকুক বা না থাকুক।

কাজেই আজ যদি কেউ বলে, রাসূলের যুগে হুইস্কি, বিয়ার, ব্রান্ডি এসব ছিল না; তাই এগুলো হারাম নয়, তো বলা বাহুল্য যে, তার এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, রাসূলের যুগে যদিও এই নামে, এই আকারে জিনিসগুলো বিদ্যমান ছিল না; কিন্তু তার প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল। মদের প্রকৃতি হলো, এমন একটি পানীয়, যা নেশাকর।

আর নবীজির যুগে মদের এই প্রকৃতিকে হারাম করা হয়েছে। এই প্রকৃতি চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে। চাই তা যে কালেই হোক এবং তার নাম যা-ই হোক।

মজার একটি কৌতুক

হিন্দুস্তানে এক গায়ক ছিল। একবার সে হজে গেল। হজ সমাপনের পর মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে এক মনযিলে যাত্রাবিরতি করল। সেযুগে চলার পথে বিভিন্ন মনযিল থাকত। মানুষ সেসব মনযিলে রাতযাপন করত এবং পরদিন সকালে সম্মুখপানে রওনা হতো। নিয়ম

অনুযায়ী হিন্দুস্তানি গায়ক রাতযাপনের জন্য এক মনযিলে অবস্থান গ্রহণ করল। উক্ত মনযিলে এক আরব গায়কও গিয়ে উপস্থিত হলো এবং ওখানে বসে আরবিতে গান গাইতে শুরু করল। আরব গায়কের কণ্ঠ ছিল খানিক কর্কশ ও কাঠখোট্টা। হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে তার গান খুব বিশ্রী ও বিরক্তিকর ঠেকল। তাই সে বলে উঠল, আজ আমার বুঝে এসেছে, আমাদের নবীজি গান-বাজনাকে কেন হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন।

তার কারণ হলো, তিনি বেদুঈনদের বেসুরো ও কর্কশ গান শুনেছিলেন। তাই তিনি গানকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি যদি আমার গান শুনতেন, তা হলে গান-বাজনাকে তিনি হারাম ঘোষণা করতেন না।

তাহলে তো শূকরও হালাল হওয়া দরকার!

আজকাল মেজাজ তৈরি হয়ে গেছে, যে কোনো বিষয়ে মানুষ হুট করে বলে ফেলে, জনাব, নবীজির আমলে তো এই আমলটি এভাবে হতো আর সেজন্য তিনি তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। বর্তমানে যেহেতু আমলটি সেভাবে হয় না, তাই সেটি হারাম নয়। যারা এ ধরনের যুক্তির অবতারণা করে, তারা এমনও বলে থাকে যে, শূকরকে এজন্য হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, সেযুগে এই জন্তুটি নোংরা পরিবেশে পড়ে থাকত, আবর্জনা খেত এবং নোংরা পরিবেশে প্রতিপালিত হতো। কিন্তু শূকর এখন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাদের জন্য উন্নতমানের ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কাজেই এখন শূকর হারাম হওয়ার কোনোই কারণ নেই। ঠিক অনুরূপ সুদের ব্যাপারেও একথাটি-ই বলা হচ্ছে যে, এই বাণিজ্যিক সুদ ও এই বাণিজ্যিক ঋণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না। বরং সে যুগে ব্যক্তিগত ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ঋণ নেওয়া হতো। কাজেই পবিত্র কুরআন সেই সুদকে কী করে হারাম ঘোষণা করতে পারে, সে যুগে যার অস্তিত্বই ছিল না। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে কেউ-কেউ বলে থাকেন, পবিত্র কুরআন যে সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেটি গরিব-অসহায় জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত সুদ ছিল। আমাদের এই কারবারি সুদ হারাম নয়।

'সুদ'-এর স্বরূপ

কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে, 'সুদ'-এর প্রকৃতি কী এবং 'সুদ' কাকে বলে। 'সুদ' জিনিসটা কী। 'সুদে'র সংজ্ঞা কী, শরীয়ত যাকে হারাম

সাব্যস্ত করেছে। তারপর দেখতে হবে, বর্তমান এ যুগের 'বাণিজ্যিক সুদে সেই প্রকৃতি পাওয়া যায় কি-না।

তো সুদের প্রকৃতি হলো, কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত ঋণের উপর যে কোনো পরিমাণ ও যে কোনো ধরনের বাড়তি দাবি করা। যেমন– আজ আমি কাউকে ঋণ হিসেবে একশো টাকা প্রদান করলাম এই শর্তে যে, এক মাস পর সে আমাকে একশো দুই টাকা পরিশোধ করবে। এরই নাম 'সুদ'।

যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ঋণ পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতা বাড়তি কিছু প্রদান করে, তা হলে তার পরিমাণ যা-ই হোক-না কেন, তা সুদ হবে না।

পবিত্র কুরআন যে সময়ে 'সুদ'কে হারাম ঘোষণা করেছে, তখন আরবদের মাঝে সুদের লেনদেন একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিষয় ছিল। সে সময়ে সুদ বলতে যা বোঝানো হতো, তা হলো, প্রদত্ত ঋণের উপর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো প্রকারের অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা

স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, তিনি যখন কারও নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, তখন পরিশোধ করার সময় কিছু বেশি দিতেন, যাতে ঋণদাতা খুশি হয়। কিন্তু বাড়তি আদান-প্রদানের কথা যেহেতু পূর্ব থেকে স্থির করা থাকত না, তাই এটা 'সুদ' হতো না।

হাদীসের পরিভাষায় একে 'হুস্‌নুল কাযা' বা 'উত্তম পরিশোধ' বলা হয়। অর্থাৎ– উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করা, পরিশোধের সময় ভালো আচরণ করা এবং কিছু বেশি দেওয়া সুদ নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পর্যন্ত বলেছেন :

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

'তোমাদের মধ্যে ঋণপরিশোধের পন্থা যার যত সুন্দর, সে তত ভালো মানুষ।' (বুখারী, হাদীস নং ২২১৮, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৫৩৯, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৮৭৪৩)

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, চুক্তি ও শর্ত আরোপ করে অতিরিক্ত আদায় করা সুদ। ঋণগ্রহীতা যদি কোনো প্রকার চুক্তি ব্যাতিরেকে পরিশোধের সময় কিছু বেশি প্রদান করে, তা হলে তা সুদ হবে না। বরং সেটি 'হুস্‌নুল কাযা'।

সারকথা হলো, সুদের এই প্রকৃতি বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোর বাণিজ্যিক ঋণে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই এই বাণিজ্যিক ঋণ হারাম বলে বিবেচিত হবে। আর তাতে বাণিজ্যিক সুদ হারাম না হওয়ার পক্ষে তার প্রবক্তাগণ যে দলিল প্রদান করেন, তার ভূমিকা ও ফলাফল ভুল প্রমাণিত হলো।

নবীজীর যুগে বাণিজ্যের বিস্তার

তাদের দলিলের ভূমিকা এই ছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে বাণিজ্যিক সুদ ছিল না। তাদের এই দাবিটিও ভুল। কারণ, আরবের যে সমাজে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন, সেখানেও আজকের এই যুগের আধুনিক বাণিজ্যের প্রায় সবগুলো ভিত্তি বিদ্যমান ছিল।

যেমন– আজকাল ব্যবসার জন্য মানুষ যৌথ কোম্পানী দাঁড় করায়, যাকে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' বলা হয়। এই পদ্ধতির ব্যাপারে ধারণা হলো, এটি চতুর্দশ শতাব্দির আবিষ্কার। তার আগে ব্যবসার এই পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমরা যখন আরবের ইতিহাসের পাতা উল্টাই, তখন দেখতে পাই, আরবের প্রতিটি গোত্র এক-একটি স্বতন্ত্র 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী' ছিল। তার কারণ ছিল, প্রতিটি গোত্রে ব্যবসার এই পদ্ধতি ছিল, গোত্রের প্রতিজন সদস্য তাদের একটি-একটি পয়সা এনে একস্থানে জমা করত। তারপর সেই অর্থ নিয়ে শাম দেশে গিয়ে ব্যবসার পণ্য ক্রয় করত। আপনারা সেকালের আরবদের যে বাণিজ্যিক কাফেলার নাম শুনেছেন, সেগুলো এ কাজ-ই করত। যেমন– পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন :

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

'যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের সফরের।' (সূরা কুরাইশ ১-২ আয়াত)

এই আয়াতে গরম ও শীতকালের যে সফরের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা এই বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোই উদ্দেশ্য, যারা শীতকালে ইয়ামেনের দিকে আর গরম কালে শামের দিকে সফর করত। তারা মক্কা থেকে পণ্য ক্রয় করে ওখানে নিয়ে বিক্রি করত আর ওখান থেকে ব্যবসাপণ্য ক্রয় করে মক্কায় এনে বিক্রি করত। এই কাফেলার এক-একজন লোক অনেক সময় নিজগোত্র থেকে দশ লাখ দিনারও ঋণ গ্রহণ করত।

বলাবাহুল্য যে, এই ঋণ তারা খাওয়ার জন্য কিংবা মৃত মানুষের কাফন-দাফনের প্রয়োজনে গ্রহণ করত না। বরং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করত।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর বাণিজ্যিক কাফেলা

হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) যে বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মক্কা থেকে আসছিলেন, যাদের উপর মুসলমানগণ আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই কাফেলাটি সম্পর্কে হাদীসবিশারদ ও সীরাতবিদগণ লিখেছেন :

لَمْ يَبْقَ قُرَشِيٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ إِلَّا وَبَعَثَ بِهِ فِي الْعِيْرِ

'কুরাইশের যে নারী ও পুরুষের কাছে একটিও দেরহাম ছিল, তারা তাদের সেই অর্থ উক্ত বাণিজ্যিক কাফেলায় প্রদান করে।'

এই তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হলো, এই গোত্রটি এমন যৌথ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করত।

বর্ণনায় এসেছে, বনু মুগীরা ও বনু ছাকীফ এই দুই গোত্রের মাঝে পরস্পর গোত্রীয় পর্যায়ে সুদের লেনদেন হতো। এক গোত্র আরেক গোত্র থেকে সুদের উপর ঋণ নিত। এক গোত্র ঋণ দিত আর অপর গোত্র ঋণ গ্রহণ করত। এক গোত্র সুদ দাবি করত আর অপর গোত্র সুদ পরিশোধ করত। আর এসব ঋণ হতো সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক।

সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা সুদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে যখন সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন :

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

'জাহেলিয়াতের সুদ রহিত করা হলো। সবার আগে আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। তার সম্পূর্ণ সুদ রহিত করা হলো।'

(মুসলিম, হাদীস নং ১২৩৭, আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬২৮, দারেমী, হাদীস নং ১৭৭৪)

হযরত আব্বাস (রাযি.) সুদের উপর ঋণ দিতেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, আমি আমার চাচা আব্বাস-এর সম্পূর্ণ সুদ রহিত করে দিলাম। যার-যার কাছে তিনি সুদ পাওনা আছেন, সেগুলো আর পরিশোধ করতে হবে না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রাযি.)-এর যে সুদ রহিত ঘোষণা করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল দশ হাজার

মিছকাল সোনা। প্রায় চার মাশায় এক মিছকাল হয়। আর এই দশ হাজার মিছকাল মূলধন ছিল না। বরং এই পরিমাণটি ছিল সুদ, যা তিনি মানুষের কাছে পাওনা ছিলেন। আপনারাই বলুন, যে বিনিয়োগের বিপরীতে দশ হাজার মিছকাল সোনা সুদ আসে, সেই ঋণ কি শুধু খাওয়া-পরার প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়েছিল? বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত ঋণ ব্যবসার জন্যই নেওয়া হয়েছিল।

সাহাবাযুগে ব্যাংকিং-এর একটি দৃষ্টান্ত

বুখারী শরীফের কিতাবুল জিহাদে আছে, হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাযি.) নিজের কাছে হুবহু এ-যুগের ব্যাংকিং সিস্টেমের মতো একটি সিস্টেম বানিয়ে নিয়েছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে বড়-বড় অংকের আমানত রাখত। তখন তিনি বলে নিতেন : لَيْسَ بِوَدِيْعَةٍ لَكِنَّهُ سَلَفٌ 'আমানত নয় – এই অর্থ আমি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছি।' (বুখারী হাদীস নং ২৮৯৭)

অর্থাৎ– তোমার এই অর্থ আমার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকল।

প্রশ্ন হলো, তিনি এমনটি কেন করতেন? হাফিয ইবনে হাজ্‌র রহ. ফাত্‌হুল বারীতে তার কারণ এই লিখেছেন যে, ঋণের এই পদ্ধতিতে উভয় পক্ষেরই লাভ ছিল। যারা আমানত রাখত, তাদের লাভ এই ছিল যে, যদি অর্থগুলো আমানত হিসেবে রাখা হতো, তা হলে হেফাজতের সঙ্গে রাখা সত্ত্বেও যদি তা খোয়া যেত বা চুরি হয়ে যেত, তা হলে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়ামকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হতো না। কারণ, আমানতের কোনো ক্ষতিপূরণ (অনেক সময়) দিতে হয় না।

পক্ষান্তরে ঋণের অর্থ হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলেও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ঋণ গ্রহীতাকে তার জরিমানা আদায় করতে হয়। কাজেই হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.) অর্থগুলো ঋণ হিসেবে রাখার কারণে যারা আমানত রাখত, তাদের লাভ হলো যে, তাদের সম্পদগুলো নিরাপদ হয়ে গেল এবং ক্ষতিপূরণযোগ্য হয়ে গেল। আবার বিপরীতে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.)-এর লাভ হলো, তাঁর এই অধিকার অর্জিত হয়ে গেল যে, এই অর্থগুলোকে তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাতে পারতেন। এই অর্থকে তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় মৃত্যুর সময় তাঁর দায়িত্বে যে ঋণ ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.) বলেন :

فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُّهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ

'আমি তাঁর ঋণগুলো হিসাব করে দেখলাম, তার পরিমাণ বাইশ লাখ দিনার।'

বলাবাহুল্য, এত বড় ঋণ 'বাণিজ্যিক ঋণ'ই ছিল। 'সার্‌ফি ঋণ' ছিল না। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে 'বাণিজ্যিক ঋণে'র প্রচলন ছিল।

তারীখে তাবারীতে আছে, হযরত উমর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উত্‌বা উমর (রাযি.)-এর কাছে এসে বাইতুল মাল থেকে ঋণ চেয়েছিল। হযতর উমর (রাযি.) তাকে ঋণ প্রদান করেছিলেন। হিন্দ বিনতে উত্‌বা বিলাদে কাল্‌ব গিয়ে সেই অর্থ দ্বারা ব্যবসা করেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত ঋণ জঠরজ্বালা মেটানোর জন্য কিংবা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য গ্রহণ করা হয়নি; বরং ব্যবসার জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

নবুয়ত ও সাহাবাযুগে এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি তাক্‌মিলায়ে ফাত্‌হুল মুল্‌হিম-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রয়োজনবোধ করলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, একথা একদম ভুল যে, নবীযুগে বাণিজ্যিক ঋণ ছিল না। বরং ইতিহাস প্রমাণ করছে, সে যুগেও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল। ইসলাম সুদ হারাম ঘোষণা করার পর তার উপর সুদের লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যে যুক্তি ও দলিলের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সুদকে হালাল বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তার ভূমিকা ও ফলাফল দু-ই ভুল প্রমাণিত হলো।

সুদ জায়েয হওয়ার পক্ষে আরও একটি দলিল

যারা সুদকে জায়েয বলেন, তাদের পক্ষ থেকে আরও একটি দলিল প্রদান করা হয় যে, কেউ যদি খাওয়ার জন্য কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারও কাছে ঋণ চায় আর ঋণদাতা এই ঋণের বিপরীতে সুদ দাবি করে, তা হলে এটি অবিচার বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যবসা করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং এই ঋণের অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে, তা হলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার সুদ দাবি করা অবিচার বলে বিবেচিত হবে না। এখানে অন্যায় বা অবিচারের কোনো বিষয় নেই।

এই দলিলের সমর্থনে তারা কুরআনের এই আয়াতটি উপস্থাপন করেন :

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

'তোমরা যদি সুদ থেকে তাওবা কর, তা হলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরাও অবিচার করবে না, তোমাদের উপরও অবিচার করা হবে না।' (সূরা বাকারা ২৭৮ আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো 'অবিচার'। আর এই অবিচার 'সারফি সুদে' পাওয়া গেলেও 'বাণিজ্যিক সুদে' পাওয়া যায় না। কাজেই 'বাণিজ্যিক সুদ' হারাম না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কারণ ও বিধানে পার্থক্য

এই দলিলের মধ্যে একাধিক ভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। প্রথম ভ্রান্তিটি হলো, এই দলিলের মধ্যে 'অবিচার'কে রিবা হারাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ অবিচার দূর করা রিবা হারাম হওয়ার কারণ নয়; বরং এটি রিবা হারাম হওয়ার হেকমত। আর বিধান নির্ভর করে কারণের উপর – হেকমতের উপর নয়। কারণ পাওয়া গেলেই বিধান জারি হয়ে যায় – হেকমতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকুক আর না থাকুক।

এর একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত হলো, আপনারা দেখে থাকবেন, রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যাল (এর লাইট) বসানো থাকে। তাতে তিন ধরনের বাতি থাকে। লাল, হলুদ ও সবুজ। যখন লাল বাতি জ্বলে, তখনকার জন্য বিধান হলো, থেমে যাও। আর সবুজ বাতি জ্বলার অর্থ হলো, চলো। সিগন্যালের এই ব্যবস্থাপনা এজন্য চালু করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে ট্রাফিকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দুর্ঘটনা রোধ হবে। তো এখানে এই যে লাল বাতি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, থেমে যাও; এটি হলো, বিধানের কারণ। আর এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা রোধ হওয়া এই বিধানের হেকমত। এক ব্যক্তি রাত বারোটার সময় গাড়ি চালিয়ে সিগন্যালের কাছে এল। তখন লাল বাতি জ্বলছিল। কিন্তু চার দিকে কোথাও আর কোনো গাড়ি নেই। কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় তার জন্য আইন কী হবে? বলা বাহুল্য যে, এ সময়েও তার জন্য বিধান হলো, থেমে যাও। কারণ, এই মুহূর্তে যদিও সিগন্যাল মান্য করার হেকমত বিদ্যমান নেই; কিন্তু কারণ বিদ্যমান আছে। আর কারণ বিদ্যমান থাকলে হেকমত বিদ্যমান থাকুক আর না থাকুক বিধান কার্যকর হবে। কাজেই এই অবস্থায়ও চালকের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া জরুরি। যদি সে না

দাঁড়ায়, তাহলে আইন অমান্য করার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং শাস্তির মুখোমুখী করা হবে।

মদ হারাম হওয়ার হেকমত

অনুরূপভাবে শরীয়তের যত বিধান আছে, সমস্ত বিধান কারণের উপর নির্ভরশীল – হেকমতের উপর নয়। দুনিয়ার আইনেও এই নীতি কার্যকর, শরীয়তের আইনেও এই নীতি কার্যকর। পবিত্র কুরআন মদ সম্পর্কে বলেছে:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

'শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তারপরও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?' (সূরা মায়েদা, ৯১ আয়াত)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার একটি হেকমত বর্ণনা করেছেন যে, মদপান ও জুয়ার ফলে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং মানুষ এর কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। এখন যদি কেউ বলে, মদ-জুয়া তখনই হারাম হবে, যখন এসবের ফলে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হবে, বিদ্বেষ জন্ম নেবে। যদি শত্রুতা ও বিদ্বেষ না জন্মায়, তা হলে এগুলো হারাম হবে না। বলা অনাবশ্যক যে, এই বক্তব্য সঠিক বলে গ্রাহ্য হবে না। কারণ, শত্রুতা ও বিদ্বেষ জন্ম নেওয়া মদ-জুয়ার হারাম হওয়ার হেকমত – কারণ নয়।

অন্যথায় আজকাল তো মানুষ বলে থাকে, মদ শত্রুতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে বন্ধুত্ব তৈরি করে। আর সেজন্যই বর্তমানে দুই বন্ধু যখন মিলিত হয়, তখন একজনের মদের পেয়ালা আরেকজনের মদের পেয়ালার সঙ্গে ধাক্কা খায়। এটিই প্রমাণ করে, মদ আমাদের দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, মদ যদি দুজনের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, তা হলে কি মদ হালাল হয়ে যাবে? কিংবা যদি কেউ বলে, আমি তো মদপান করছি; কিন্তু কই আল্লাহর স্মরণ থেকে তো আমি উদাসীন হচ্ছি না; কাজেই আমার জন্য মদ হালাল। তো এই ব্যক্তির জন্য মদ হালাল হয়ে যাবে কি? বলা বাহুল্য যে, এই ব্যক্তির জন্য মদ হালাল হবে না। কারণ, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া মদ হারাম হওয়ার হেকমত – কারণ নয়। আর বিধানের নির্ভরতা কারণের উপর – হেকমতের উপর নয়।

সুদের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ যে, 'অবিচার' সুদ হারাম হওয়ার কারণ নয় – হেকমত। 'তোমরাও অবিচার করবে না; আবার তোমাদের উপরও অবিচার করা হবে না' কথাটি সুদ হারাম হওয়ার হেকমত হিসেবে বলা হয়েছে। এটি সুদ হারাম হওয়ার কারণ নয়। কাজেই সুদ হারাম হওয়ার সম্পর্ক অবিচার পাওয়া-না-পাওয়ার সঙ্গে নয়। বরং এর সম্পর্ক হলো, সুদের হাকীকত পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গে। যেখানেই সুদের হাকীকত পাওয়া যাবে, সেখানেই হারামের বিধান কার্যকর হয়ে যাবে–অবিচার পাওয়া যাক আর না যাক। এ হলো একটি বিভ্রান্তি।

শরীয়তের বিধানে ধনী আর গরিবের কোনো পার্থক্য নেই

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো, যারা সুদ'কে জায়েয বলেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, সারফী ঋণে কোনো ব্যক্তি যদি সুদ দাবি করে, তা হলে যেহেতু সার্‌ফি ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা গরিব মানুষ, তাই তাদের থেকে সুদ দাবি করা জুলুম। কিন্তু বাণিজ্যিক ঋণের সুদ এমন নয়। কারণ, এই ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা পুঁজিপতি ও ধনী; তাদের থেকে সুদ দাবি করায় জুলুমের কিছু নেই। এটিও একটি ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি। অথচ আসল বিষয় হলো, ঋণের উপর সুদ দাবি করা জায়েয, নাকি না-জায়েয? আপনি যদি বলেন, ঋণের উপর সুদ গ্রহণ করা জায়েয নয়, তা হলে তাতে ধনী-গরিবের কোনো পার্থক্য না থাকা উচিত।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝুন। এক ব্যক্তি রুটি বিক্রি করছে। একটি রুটি তৈরি করতে খরচ পড়ে বারো আনা। চার আনা লাভ ধরে একটি রুটির মূল্য নির্ধারণ করেছে এক টাকা। সে ধনী আর গরিবের মাঝে কোনো পার্থক্য রাখেনি যে, গরিবদেরকে কম দামে রুটি দেবে আর ধনীদের থেকে বেশি নেবে। বরং সবাইকে একই দামে রুটি দিচ্ছে। কিন্তু কেউ একথা বলছে না যে, তুমি একটি রুটির বিনিময়ে গরিবদের কাছ থেকে এক টাকা নিয়ে জুলুম করছ। কারণ, সে তার ন্যায্য পাওনা-ই উসুল করছে। আর ধনী-গরিব সকলের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করা জায়েয আছে। এতে কোনো প্রকার অবিচার নেই।

ঠিক তদ্রূপ একজন গরিব মানুষ কারও কাছে থেকে ঋণ চায় আর ঋণদাতা তার নিকট থেকে সুদ দাবি করে। তো আপনি বলছেন, যেহেতু ঋণগ্রহীতা লোকটি গরিব; তাই তার থেকে সুদ দাবি করা অবিচার। প্রশ্ন

হলো, এক ব্যক্তি একজন গরিব মানুষের কাছে মুনাফায় রুটি বিক্রি করছে; কিন্তু তাতে কোনো অবিচার হচ্ছে না; কিন্তু আরেকজন সেই গরিব লোকটিকেই ঋণ দিয়ে সুদ দাবি করছে; এটি অবিচার হবে কেন? আপনারা এ কেমন কথা বলছেন?

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, এখানে অবিচারের কারণ 'দারিদ্র্য' নয়। বরং অবিচারের আসল কারণ এখানে অতিরিক্তি 'অর্থ'। আর এই কারণ গরিবের ঋণের মধ্যে যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি ধনী-পুঁজিপতিদের ঋণের মাঝেও পাওয়া যাচ্ছে। আমার আলোচনার ফলাফল দাঁড়াল, রুটি তৈরি করে লাভে বিক্রি করা অবিচার নয়; বরং জায়েয ও সুবিচারের অনুকূল। কিন্তু (ঋণের) অর্থের উপর বাড়তি দাবি করা সুবিচারেরও পরিপন্থী আবার শরীয়তেরও খেলাফ। কারণ, অর্থ এমন কোনো বস্তু নয়, যার উপর মুনাফা দাবি করা যেতে পারে। কাজেই অর্থ ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরিব উভয় অবস্থাতেই তার উপর সুদ হারাম হওয়ার বিধান কার্যকর হবে।

লাভ-লোকসান উভয়ে অংশীদার হতে হবে

যারা বাণিজ্যিক সুদকে জায়েয বলেন, তারা একটি কথা এও বলেন যে, বাণিজ্যিক সুদে জুলুম নেই। এটিও একদম ভুল কথা। বিষয়টিকে খানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে বোঝা দরকার। দেখুন, শরীয়ত এই মূলনীতি বর্ণনা করেছে যে, তুমি যদি কাউকে ঋণ প্রদান কর, তা হলে আগে এই সিদ্ধান্ত নাও, এই ঋণের মাধ্যমে তুমি তাকে সাহায্য করতে চাও, নাকি তার কারবারে অংশীদার হতে চাও। যদি ঋণ প্রদানে তোমার উদ্দেশ্য হয় তাকে সাহায্য করা, তা হলে তাকে শুধু সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দাও। তখন এই ঋণের বিপরীতে তোমার জন্য তার থেকে বাড়তি দাবি করা জায়েয হবে না। আর যদি এই অর্থের মাধ্যমে তুমি তার কারবারে অংশীদার হতে চাও, তা হলে তোমাকে তার কারবারের লাভ-লোকসান উভয়ের অংশীদার হতে হবে। এটা হতে পাররে না যে, আপনি তাকে বলে দেবেন, আমি তোমার লাভের অংশীদার হব; কিন্তু লোকসানের অংশীদার হব না।

সুদে বাণিজ্যিক ঋণদাতা ব্যাংক পুঁজিপতিকে বলে দেয়, আমি এই ঋণের উপর তোমার থেকে পনেরো শতাংশ সুদ নেব। তোমার ব্যবসায় লাভ হোক বা লোকসান হোক আমি তা দেখব না। তোমার লাভ-লোকসানের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার কেবল সুদ দরকার। বলা বাহুল্য যে, এই চরিত্র ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী।

বেশি অবিচার ঋণদাতার উপর

এই বাণিজ্যিক সুদ একটি গোলকধাঁধা। এর প্রতিটি পদ্ধতি অবিচার। যদি পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর মুনাফা হয়, তা হলেও জুলুম, যদি লোকসান হয়, তা হলেও জুলুম। লাভ হলে ঋণদাতার উপর জুলুম। আর লোকসানের সময় ঋণগ্রহীতার উপর জুলুম। বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকগুলোতে যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে বেশি জুলুম হচ্ছে ঋণদাতার উপর।

কথাটি বুঝতে হলে আগে আরও একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, সাধারণত ব্যাংকগুলোতে জনসাধারণের রাখা আমানত থাকে। দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ দ্বারা-ই একটি ব্যাংক অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু এই জনসাধারণই যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে যায়, তা হলে ব্যাংক তাদের ঋণ দেবে না। বরং ব্যাংক ঋণ দেবে সেই পুঁজিপতিকে, যার কাছে আগে থেকেই পুঁজি আছে; এখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি তার ব্যবসার পরিধি আরও সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছেন। কিংবা এমন পুঁজিপতিকে দেবে, যার মিল-ফ্যাক্টরি আছে; তিনি তার এই ব্যবসাকে আরও বড় করতে চাচ্ছেন।

এবার হচ্ছে কী? ধরুন, একজন পুঁজিপতি পনেরো শতাংশ সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিল। তার সঙ্গে নিজের থেকে আরও কিছু যোগ করে কারবার শুরু করল। অনেক সময় কারবারে শতভাগ মুনাফা হয়ে যায়। আবার অনেক সময় কমও হয়। মনে করুন, এই ব্যবসায়ী তার কারবারে শতভাগ মুনাফা করল, যার ফলে তার এক লাখ টাকা দুলাখ টাকা হয়ে গেল। এক লাখ আসল পুঁজি আর এক লাখ মুনাফার অর্থ। এই মুনাফা থেকে সে পনেরো শতাংশ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করল। অবশিষ্ট পঁচাশি হাজার টাকা নিজের পকেটে রেখে দিল। তারপর ব্যাংক এই পনেরো হাজার টাকা থেকে নিজের খরচাদি কেটে রাখার পর সাত হাজার টাকা সেই জনসাধারণকে দিল, যাদের অর্থ দ্বারা ব্যবসায়ী ব্যবসা করে এক লাখ টাকা আয় করেছিল এবং তার থেকে পঁচাশি হাজার টাকা নিজের পকেটে রেখেছে। এর দ্বারা অনুমান করুন, এই জনসাধারণের উপর কী পরিমাণ অবিচার হচ্ছে! কিন্তু সেই জনসাধারণ খুবই আনন্দিত যে, আমি সাত হাজার টাকা মুনাফা পেয়ে গেছি। অথচ তার এক লাখ টাকায় এক লাখ টাকা মুনাফা হয়েছিল!

আরও দেখুন, জনসাধারণ যে সাত হাজার টাকা পেয়েছিল, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী সেই টাকাগুলোও অন্যভাবে জনসাধারণ থেকে উসুল করে নিচ্ছে। তা এভাবে যে, ব্যবসায়ীদের নিয়ম হলো, তারা ব্যাংককে যে সুদ প্রদান করে, তা তাদের পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যোগ করে নেয়।

যেমন– এই ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে নেওয়া এক লাখ টাকা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করলেন। তিনি এই কাপড়গুলোর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের আগে হিসাব করে দেখবেন, এগুলো প্রস্তুত করতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। তখন সেই ব্যয়ের সঙ্গে ব্যাংকের সুদ বাবদ প্রদত্ত পনেরো হাজার টাকাও যোগ করে নিচ্ছেন। তারপর নিজের মুনাফা ধার্য করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। তাতে এই কাপড়গুলোর উৎপাদনব্যয় আপনা-আপনি পনেরো শতাংশ বেড়ে যাচ্ছে। তারপর জনসাধারণ যখন বাজারে গিয়ে এই কাপড়গুলো ক্রয় করবে, তখন তারা সেই পনেরো শতাংশ সুদের টাকাও পরিশোধ করে আসবে, যা ব্যবসায়ী ব্যাংককে দিয়ে এসেছে। এভাবে একজন পুঁজিপতি একদিকে জনসাধারণকে মাত্র সাত শতাংশ মুনাফা প্রদান করছে, অপরদিকে তাদের থেকে সুদ বাবত পনেরো শতাংশ উসুলও করে নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও জনসাধারণ খুশি যে, আমি সাত শতাংশ মুনাফা পেয়ে গেছি। অথচ বাস্তবতা হলো, তিনি যে-এক লাখ টাকা ব্যাংকে আমানত রেখেছিলেন, তার থেকে ফেরত পেয়েছেন মাত্র বিরানব্বই হাজার পাঁচশত টাকা!

এই বিশ্লেষণ সেই অবস্থার জন্য, যেখানে ব্যবসায়ী ব্যবসা করে লাভবান হলেন। কিন্তু যদি তার লোকসান হয়ে যায়, তা হলে সে ক্ষেত্রে তার লোকসানের প্রতিকারের জন্য সে ব্যাংক থেকে আরও ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে তার ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে, যার ফলে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায়। আর একটি ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, যে লোকগুলো এই ব্যাংকে আমানত রেখেছিল, তারা সেসব আর ফেরত পাবে না। যেমনটি কিছুদিন আগে আমাদের বিসিআইসি ব্যাংকের বেলায় ঘটেছিল। যেন এই ক্ষেত্রে সমস্ত লোকসান জনসাধারণেরই হলো। ব্যবসায়ীর কোনোই ক্ষতি হলো না।

এর দ্বারা অনুমান করে নিন, 'বাণিজ্যিক ঋণের সুদ'-এর কারণে যে অবিচারটি হচ্ছে, তা 'সার্‌ফি ঋণের সুদ'কেও হার মানিয়ে দিল। কারণ, ব্যবসায় অর্থের ব্যবহার হচ্ছে পুরোটা জনসাধারণের। কিন্তু লাভ হলে তার মালিক পুঁজিপতি আর লোকসান হলে তার দায় জনসাধারণের। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে? এ হলো লোকসানের সেই সুরত, যেখানে স্বয়ং ব্যাংকই দেউলিয়া হয়ে যায়। কিন্তু যদি ব্যবসা চলাকালে পুঁজির আংশিক ক্ষতি হয়ে যায়; যেমন– ব্যবসায়ী কাপড় তৈরি করার জন্য তুলা ক্রয় করেছিল। সেই তুলায় আগুন ধরে গেল। তো এই ক্ষতির প্রতিকারের জন্য উক্ত পুঁজিপতির সামনে আরেকটি পথ খোলা আছে। তা হলো, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি।

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তার সেই ক্ষতি পূরণ করে দেবে। আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যে অর্থ আছে, তারও মালিক গরিব জনগণ। সেই জনগণ, যারা তাদের গাড়িগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় নামাতে পারে না, যতক্ষণ-না তার ইন্স্যুরেন্স করিয়ে নেবে। জনসাধারণের গাড়ি একসিডেন্ট তো কালে-ভদ্রেই হয়ে থাকে; কিন্তু বীমার কিস্তি তাদেরকে যথারীতিই পরিশোধ করতে হয়। কাজেই এখানে দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিপতিরা জনসাধারণেরই অর্থ দ্বারা তাদের লোকসানের ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

সুদের গুনাহের সর্বনিম্ন স্তর মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা

এসব গোলকধাঁধা এজন্য তৈরি করা হলো, যাতে যদি লাভ হয়, তা হলে তা যেন পুঁজিপতির পকেটে ঢোকে। আর যদি লোকসান হয়, তা হলে তার ঘানি যেন জনসাধারণ টানে। এর ফলে সম্পদ নিচের দিকে নামার পরিবর্তে উপর দিকে উঠছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে। গরিব আরও গরিব হচ্ছে। সুদের এই অপকারিকতাগুলোর কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا كَالَّذِىْ يَقَعُ عَلٰى أُمِّهِ

'সুদের (গুনাহের) সত্তরটি স্তর আছে। সর্বনিম্ন স্তর হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে তার মায়ের উপর উপগত হয়।' (আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং ২৮৪৭ শুআবুল ঈমান হাদীস নং ৫৫২)

আল্লাহপাক আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

কাজেই একথা বলা যে, বাণিজ্যিক সুদে জুলুম নেই, এটি একদম ভুল কথা। এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে যে, সমগ্র জাতিকে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে?

আজ সমগ্র বিশ্বে সুদি ব্যবস্থা চালু আছে। আর এই ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

তবে ইনশাআল্লাহ এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষের সামনে এর বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যাবে। মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে, পবিত্র কুরআন কেন সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে বুঝবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী– খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭-৫৭

সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এক বাণীতে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন:

'সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে। কারণ, সুদ খাওয়ার কারণই হলো কৃপণতা। কাজেই একজন সুদখোর মহাজন সুদ যত খেতে থাকে, তার কৃপণতা তত বাড়তে থাকে। এমনকি একটি সময় এমনও আসে যে, সে নিজের দেহের জন্যও ব্যয় করতে রাজি হয় না।' (আনফাসে ঈসা : পৃষ্ঠা ; ১৯১)

সম্পদ বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে উদারতা ও অমুখাপেক্ষিতা তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও কৃপণতার বৈশিষ্ট্য হলো, সম্পদ যত বাড়ে, কৃপণতার মাত্রা ও সম্পদের মোহ তত বৃদ্ধি পায়। একজন মানুষ যদি কৃপণ হয়, তা হলে তার সম্পদের পরিমাণ যতই হোক-না কেন, তার ফলে তার মধ্যে তুষ্টি তৈরি না হয়ে সম্পদ অর্জনের চাহিদা আরও বাড়তে থাকে। নিয়ম হলো, সম্পদের পরিমাণ যত বাড়বে, নিজের মধ্যে স্বনির্ভরতা তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কৃপণের মধ্যে তা সৃষ্টি হয় না এবং ব্যয় করার মানসিকতাও তৈরি হয় না। বরং সম্পদের মোহ আরও বেড়ে যায়। এক হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَوْ كَانَ لَهٗ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ.

'আদমের সন্তানদের স্বভাব হলো, তাদের যদি সোনার একটি উপত্যকা জুটে যায়, তা হলে দুটির অন্বেষণে নেমে পড়ে। যদি দুটি জুটে যায়, তা হলে তৃতীয় আরও একটির লোভে পড়ে।'

(বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৯, মুসলিম হাদীস নং ১৭৩৮, তিরমিযী হাদীস নং, ২২৫৯, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১২২৫৬)

তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত চমৎকার একটি বাক্যে মানুষের এই চরিত্রের সারমর্ম ব্যক্ত করেছেন।

বলেছেন :

وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ

'আসল কথা হলো, আদমসন্তানের পেট (কবরের) মাটি ছাড়া আর কিছুতে ভরতে পারে না।'

মানুষের পেট তখনই ভরবে, যখন তার মধ্যে মাটি পুরবে। মানুষ যদি কানা'আত তথা হালাল ও স্বাভাবিক উপায়ে যখন যা জোটে, তাতে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো চরিত্র সৃষ্টি না করে এবং অন্তরে সম্পদের মোহ বাড়তে থাকে, তা হলে এমন ব্যক্তির পেট কোনো কিছুতেই ভরতে পারে না।

এক সওদাগরের বিস্ময়কর ঘটনা

শেখ সা'দী রহ.-এর কবিতার চারটি চরণ আছে :

آن شنیده استی که در صحرائے غور رخت سالار افتاده اسپ طور

گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

'আমি তোমাকে একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। গাওর মরু উপত্যকায় বড় এক ব্যবসায়ীর ব্যবসাপণ্য খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। মালগুলো ওখানে পতিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার খচ্চরটিও ওখানে মৃত পড়ে ছিল। সওদাগর নিজেও ওখানে মারা গিয়েছিল। তার মালপত্রগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। সেগুলো ভাববাচ্যে বলছিল, দুনিয়াদারের সংকীর্ণ দৃষ্টিকে মাত্র দুটি জিনিস ভরতে পারে। একটি হলো কানা'আত (অল্পেতুষ্টি) আর অপরটি কবরের মাটি। তৃতীয় আর কোনো বস্তু তাকে ভরতে পারে না।'

মোটকথা, কৃপণতার বৈশিষ্ট্য হলো, সম্পদ যত বাড়তে থাকবে, লোভও তত বাড়তে থাকবে এবং ব্যয়ের পথে তত বেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে থাকবে।

বড় এক পুঁজিপতির উক্তি

করাচিতে বড় মাপের একজন পুঁজিপতি আছেন। পাকিস্তানের নামকরা শীর্ষস্থানীয় দু-চারজন ধনীর একজন। মিলিয়নপতি-বিলিয়নপতি হবেন হয়ত। একদিন তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ

পাক আপনাকে অনেক অর্থ দান করেছেন। আপনার অনেকগুলো মিল-কারখানা আছে। সব কিছুই আপনি করে নিয়েছেন। এবার মুনাফার চিন্তা বাদ দিয়ে কিছু কাজ আল্লাহর জন্য করুন। যেমন– এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করুন, যেটি সুদ ছাড়া চলবে। আপনার কাছে যেহেতু বিপুল অর্থ আছে; তাই আপনি এ কাজটি করতে পারেন।

তিনি বললেন, মাওলানা ছাহেব! সেই ব্যাংকটি কীভাবে চলবে? আমি বললাম, আল্লাহ চাহেন তো চলবে। কিন্তু আপনি এই ব্যাংকটি এই নিয়তে করবেন যে, এখানে যা বিনিয়োগ করলাম, সবই গেছে। বিলিয়ন-মিলিয়ন টাকা যেহেতু আপনার আছে, এমতাবস্থায় কয়েক কোটি গেলে তাতে আপনার এমন কী আর আসবে-যাবে। এখানে কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তার কথা আপনি ভুলে যাবেন।

তিনি চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, কী বললেন; এই টাকার কথা আমি ভুলে যাব? আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি ভুলে যাবেন যে, আপনার এই টাকাগুলো কোথাও গেছে। তবে আল্লাহপাক চাইলে তাতে মুনাফাও দিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে তার কথা ভুলে যেতে হবে। শেষে তিনি বললেন, মাওলানা ছাহেব! কথা তো আপনি ঠিকই বলছেন; কিন্তু হাতের খুজলিকে আমি কী করব?

গরিব ও ধনীর ব্যয়ের পার্থক্য

এ হলো সম্পদ বাড়ানোর খুজলি। হযরত থানভী রহ. বলেন, এই কৃপণতাও পরে ধীরে-ধীরে খুজলির রূপ ধারণ করে। তারপর মানুষের কাছে যত সম্পদই আসুক-না কেন, তার লোভ মিটে না। আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, গরিব মানুষেরা যতটা মনের খুশিতে দান করে, মসজিদ-মাদরাসায় চাঁদা দেয়, কোটিপতি-মিলিয়নপতি-বিলিয়নপতিরা অতটুকু মনের খুশিতে দান করে না। অথচ ধনী লোকটির কাছে সুযোগ বেশি আছে। গরিবের অতটা সুযোগ নেই। এসবই সম্পদের লোভের কুফল।

সুদখুরির মানসিকতা কৃপণতা জন্ম দেয়

এই কৃপণতার সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো সুদ। কারণ, সুদের অর্থ হলো, কাজ কিছুই করবে না, কোনো ঝুঁকি মাথায় নেবে না; কিন্তু পয়সা দিয়ে পয়সা বানাও। এটি কৃপণের কাজ। আর সুদখুরির মানসিকতা যেহেতু মানুষের মধ্যে কৃপণতা সৃষ্টি করে, তাই দুনিয়াতে যত সুদখোর জাতি অতীত হয়েছে, সব চেয়ে বেশি কাঞ্জুসীও তাদেরই মাঝে বিদ্যমান আছে। জগতে

সব চেয়ে বড় সুদখোর জাতি হলো ইহুদি। কুরআন ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে :

وَاَخْذِهِمِ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ

'...আর তাদের সুদ গ্রহণ করার কারণে। অথচ তাদেরকে সুদ খেতে বারণ করা হয়েছিল।' (সূরা নিসা, ১৬১ আয়াত)

আজও পৃথিবীর সমস্ত সুদি কারবার সেই ইহুদিদেরই হাতে। আর এরা-ই জগতের সব চেয়ে কাঞ্জুস জাতি। সারা পৃথিবীতে এরা কৃপণ জাতি হিসেবে পরিচিত।

এক সুদখোর ইহুদির ঘটনা

আপনারা 'শাইলাক'-এর ঘটনা শুনে থাকবেন। এটি রোমের একটি ঘটনা। এক ইহুদি ছিল। তার নাম 'শাইলাক'। এক লোক ঠেকায় পড়ে তার কাছে কিছু টাকা ধার আনতে গিয়েছিল। শাইলাক বলল, আমি সুদ ছাড়া ঋণ দেই না। লোকটি বাধ্য হয়ে সুদের চুক্তিতে ঋণ গ্রহণ করল। শাইলাক তাকে বলে দিল, এত দিনের মধ্যে পারিশোধ করতে হবে আর আমাকে মূল টাকার অতিরিক্ত এত টাকা সুদ দিতে হবে।

মেয়াদ শেষ হয়ে গেল এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দিনটি এসে পড়ল। শাইলাক ঋণের টাকা উসুল করার জন্য ঋণগ্রহীতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু যেহেতু ঋণগ্রহীতা লোকটি গরিব ছিল; তাই সে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলো। বলল, আমার কাছে তো কোনোই টাকা নেই যে, আপনাকে দেব। থাকলে দিয়ে দিতাম। শাইলাক আরেকটি তারিখ ধার্য করে দিয়ে বলল, এই তারিখের মধ্যে দিয়ে দিয়ো আর তোমার সুদ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তখন তোমাকে ডাবল সুদ আদায় করতে হবে।

সেই তারিখটিও এল। শাইলাক তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। ঋণগ্রহীতা বলল, আপনি তো সুদ ডাবল করে দিয়েছেন; যা আদায় করতে আমি অপারগ। কাজেই সুদের অংশটা বাদ দিয়ে আসল টাকাটা নিয়ে নিন এবং আমাকে এই ঋণের দায় থেকে মুক্তি দিন। শাইলাক বলল, না, তা হবে না–আমাকে পুরোপুরি-ই দিতে হবে। একটি টাকাও আমি তোমাকে মাফ করতে পারব না। তবে এটুকু করতে পারি যে, আমি তোমাকে আরেকটি তারিখ ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি; সেই তারিখে যদি না দাও, তা হলে আমি তোমার শরীর থেকে এক পাউন্ড গোশত কেটে নিয়ে তা চিবিয়ে খাব। আর টাকা তো আলাদা উসুল করবই।

সেই তারিখটিও এসে পড়ল। গরিব ঋণগ্রহীতা বেচারা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলো। শাইলাক তার ঘরে ছুরি নিয়ে হাজির হলো। গরিব বেচারা পেরেশান হয়ে গেল এবং কোনোমতে পালিয়ে রাজদরবারে রাজার কাছে চলে গেল। গিয়ে রাজাকে বলল, মহারাজ! আমি একটি বিপদে পড়েছি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শাইলাক আমার গায়ের গোশত কেটে নিতে চাচ্ছে।

আদালতে মামলা হলো। ঋণগ্রহীতা লোকটিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হলো। বিচারের জন্য এজলাস বসল। শাইলাক আদালতে জোরালো বক্তব্য দিল। তাতে সে বলল, মাননীয় আদালত! আমার সঙ্গে সুবিচার করুন। এই লোকটি এতদিন যাবত আমার সঙ্গে টালবাহানা করছে। আমার থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে এখন পরিশোধ করছে না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আমাকে তার গায়ের গোশত কেটে দেবে বলে এখন তাও দিচ্ছে না। আমি আদালতের কাছে এর সুবিচার কামনা করছি। আমি আশা করি, আদালত আমার পক্ষে এই ডিক্রি জারি করবেন, যাতে আমি তার গোশত কেটে নিতে পারি। কারণ, আমার জানামতে এটি-ই ন্যায় বিচারের দাবি।

ঋণগ্রহীতা গরিব লোকটি কারাগারে বন্দী ছিল। তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। তার পক্ষে তার স্ত্রী আদালতে এল। সে স্বামীর পক্ষে বক্তব্য দিল। বলল, মহামান্য আদালত! সুদখোর শাইলাক আপনার কাছে সুবিচার দাবি করেছে। তার দাবি অনুসারে সুবিচার হলো, তাকে আমার ঋণগ্রহীতা স্বামীর গায়ের গোশত কেটে নেওয়ার অধিকার প্রদান করা। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আল্লাহ যদি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সুবিচারই করেন, তা হলে আমাদের ঠিকানা কোথায় হবে? এই জগতে সুবিচারই সব কিছু নয়। দয়া বলেও একটি কথা সংসারে আছে। আল্লাহপাক আমাদের উপর দয়া করবেন। আল্লাহর দয়া ছাড়া আমরা মুক্তি পাব না।

বাদশাহ দয়ার ভিত্তিতে লোকটির পক্ষে রায় প্রদান করলেন।

তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম, শাইলাক-এর মতো ইহুদি জাতি সারা জগতে কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

হিন্দু সুদখোর জাতি

ইহুদিদের পর দুনিয়াতে দ্বিতীয় পর্যায়ের বড় সুদখোর জাতি হলো হিন্দু। আপনারা হিন্দু 'বেনিয়া'দের কথা শুনে থাকবেন। ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে 'মহাজন'ও বলা হয়। এরা সুদখোর সম্প্রদায়। এদের কৃপণতা কার্পণ্যের উপমা। তারা এক-একটি পাইয়ের হিসাব করে থাকে।

হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ

আমার আব্বাজি মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহ. হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ শোনাতেন।

প্রবাদটি হলো :

لالہ جی گئے پاؤنے، چار دن میں آئے، لالہ جی کے گھر آگئے چار پاؤن نے، لالہ جی نہ گئے نہ آئے

হিন্দু বেনিয়াদের 'লালাজি' বলা হয়। 'পাওনে' অর্থ অতিথি। তো প্রবাদটির অর্থ হলো, লালাজি এক বাড়িতে মেহমান হয়ে চারদিন থাকলেন। তাতে তার চার দিনের ব্যয় সাশ্রয় হলো। চারদিন পর যখন ফিরে এলেন, তখন চার ব্যক্তি তার বাড়িতে মেহমান হলো। তারা একদিন বেড়াল। চারদিন অন্যের বাড়িতে মেহমান হয়ে তিনি যতটুকু সাশ্রয় করেছিলেন, তা শেষ হয়ে গেল। খরচ তার সমান-সমান হয়ে গেল। ফলে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আর যাবও না, কাউকে আসতেও দেব না।

মোটকথা, তারা এভাবে হিসাব করে চলে, যেন একটি পাইও খরচ না হয়। মূলত সুদের মানসিকতা-ই এই কার্পণ্য জন্ম দেয়।

অর্থনৈতিক পাপ কার্পণ্য জন্ম দেয়

মনে রাখবেন, যার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধিবিধানের কোনো তোয়াক্কা নেই, তারই অবস্থা এমন হয় যে, তার কাছে যত অর্থই আসুক-না কেন, সে যত বিত্তেরই অধিকারী হোক-না কেন, লোভ তার ততই বাড়তে থাকে। অর্থ ব্যয় করতে তাদের ততই হৃদয় কাঁপে। গরিব মানুষেরা নির্ভাবনায় ব্যয় করবে। কিন্তু যারা কাড়ি-কাড়ি টাকার মালিক – যারা অর্থের সাপ হয়ে বসে আছে, তারা ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে না। মনে রাখবেন, এই অর্থনৈতিক পাপ কৃপণতা জন্ম দেয়। আর কৃপণতার কারণে সম্পদের মোহ আরও বাড়তে থাকে।

বেশি-বেশি এই দু'আটি করুন

এর থেকে বাঁচার একটিমাত্র পথ আছে। তা হলো, মানুষ নিজেকে শরীয়তের অনুগামী বানাবে, অন্তরে কানা'আত সৃষ্টি করবে এবং বেশি-বেশি করে এই দু'আটি করবে :

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِيْ مِنْكَ بِخَيْرٍ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে-সম্পদ দান করেছেন, তার উপর আমাকে কানা'আত দান করুন এবং তাতে আমাকে বরকত দিন। আল্লাহপাক যখন অল্প সম্পদে বরকত দিয়ে দেন, তখন সেই সম্পদ লাখ-কোটি টাকার চেয়েও বেশি উপকার দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর দেওয়া রিযিকে যদি বরকত না থাকে, তা হলে কোটি টাকাও বেকার হয়ে যায়। তার দ্বারা কোনোই উপকার হয় না।

তারপর নবীজি বলেছেন, হে আল্লাহ! যে সম্পদ আমার কাছে মজুদ নেই, তার বদলে আপনি আমাকে সেই জিনিসটি দান করুন, যেটি আপনার দৃষ্টিতে কল্যাণকর। অর্থাৎ– কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ আমি তার কী জানব! আমার জ্ঞান তো সীমিত। আমার চিন্তা সে পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই হে আল্লাহ! এই বিষয়টি আমি আপনার উপর ছেড়ে দিলাম যে, যে জিনিস আমার কাছে মজুদ নেই, তার বদলে আপনি আমাকে সেই সম্পদ দান করুন, যেটি আপনার দৃষ্টিতে ভালো ও কল্যাণকর।

(মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড : ৭ পৃষ্ঠা : ১০৩,
কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৫০৯৪, আল মুসতাদরাক, হাদীস নং ১৮৩১,
আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭০২)

হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করা জায়েয

তবে একথাটিও বুঝে নিন যে, আল্লাহর কাছে কানা'আতের দু'আ তো করবেন; কিন্তু জায়েয ও হালাল পন্থায় সেই সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা করা কানা'আতের পরিপন্থী নয়। তার দলীল হলো, খোদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যদি হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানো জায়েয না হতো, তা হলে নবীজি ব্যবসার প্রতি উৎসাহ দিতেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, জায়েয ও হালাল পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করার অনুমতি আছে।

কিন্তু বিশ্বাস রাখতে হবে, হালাল পন্থায় আল্লাহপাক যা-কিছু দান করবেন, তা তাঁর নেয়ামত। তার জন্য আল্লাহপাকের শোকর আদায় করে তাকে কাজে লাগাতে হবে। আর না-জায়েয পন্থায় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা কখনো করবেন না। এমন চিন্তাও কখনও মনের মাঝে স্থান দেবেন না। আর অন্তরে সেই সম্পদের লোভ জন্ম নিতে দেবেন না।

আল্লাহপাক আমাদেরকে একথাগুলো বুঝবার ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাজালিস– খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১০-১২১

- সমাপ্ত -

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি কিতাব



MAKTABATUL-ASHRAF

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com